শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর

পঞ্চশত বর্ষ আবির্ভাব পূর্তি উৎসব

স্মরণিকা

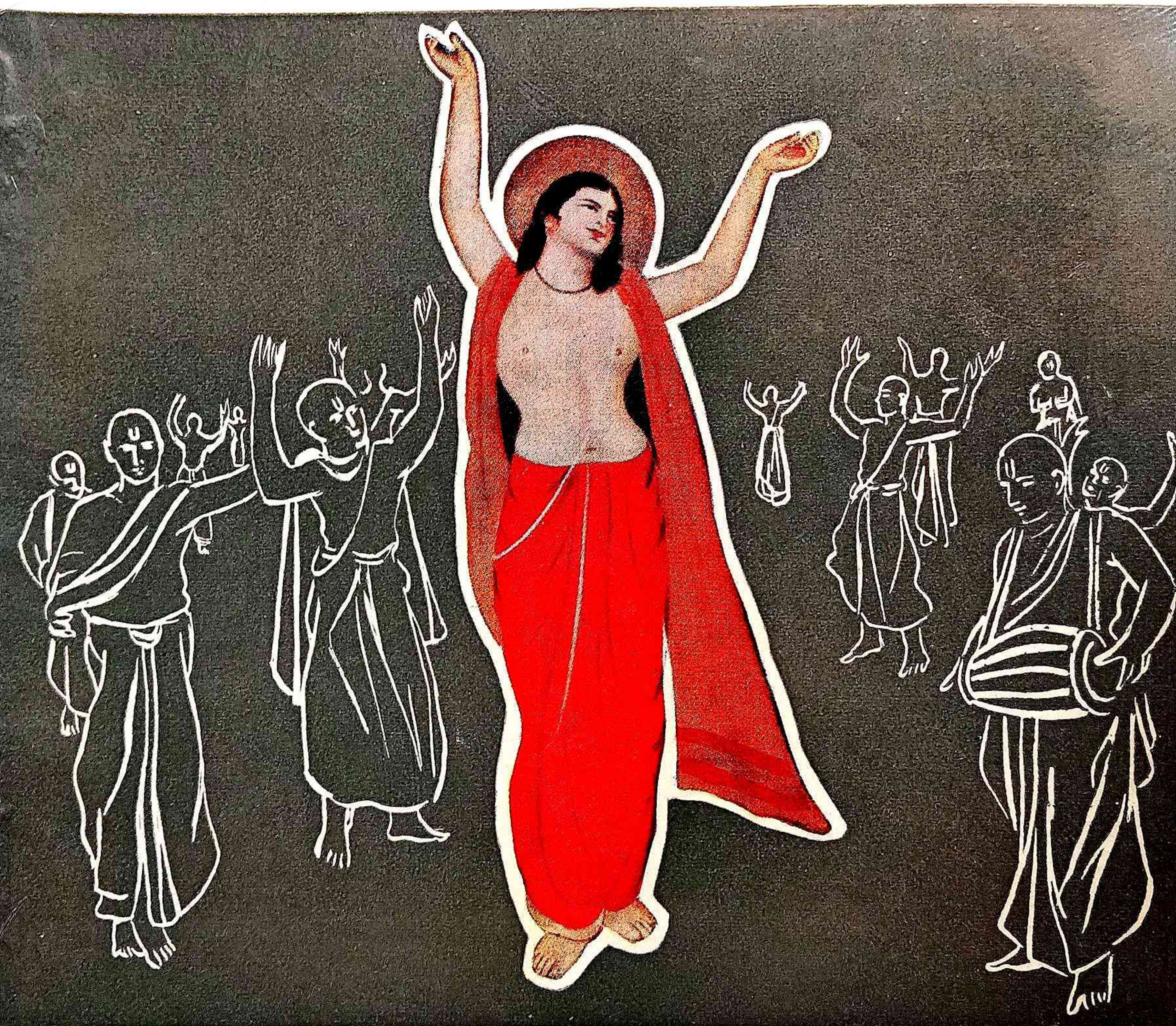

শ্রীপাটবাড়ী আশ্রম · বরাহনগর কলিকাতা-৩৫

১৩৯২

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

প্রেমাবতার পতিতপাবন

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর

শুভ পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব পূর্ত্তি উপলক্ষে

স্মরণিকা

সন—৮৯২-১৩৯২
খৃঃ—১৪৮৬-১৯৮৬

শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম

কলিকাতা-৩৫

১লা মাঘ ১৩৯২

বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাস্ট বোর্ড কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভিক্ষা—বার টাকা

মুদ্রক শ্রীতরুণকুমার মণ্ডল
মোনালিসা প্রিন্টার্স। ৮৩/৬ বেলগাছিয়া রোড। কলিকাতা ৩৭

ভূমিকা

স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভ পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব পূর্তি উৎসব প্রায় সর্ব্বত্র উদ্‌যাপিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম কর্তৃপক্ষ সাধ্যমত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের উক্ত পঞ্চশত আবির্ভাব পূর্ত্তি উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। আপনাদের শুভাগমনে এবং সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতায়, উৎসব সার্থক হউক—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আবির্ভাব এক অপূর্ব্ব অবতারের আবির্ভাব—যা হয় নাই, হবার নয়। রসরাজ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীকৃষ্ণমনোমোহিনী শ্রীরাধিকা—এই দুই মহাভাবের একত্র মিলন। এ এক অপরূপ দৃশ্য! যেন নিরন্তর বর্ধনশীল ক্ষুধার সহিত অফুরন্ত সুখাদ্যের মিলন, যেন অপ্রাকৃত নিরবধি ক্রমবর্ধমান রসতৃষ্ণার সহিত অনন্ত প্রতিক্ষণে নব নব আস্বাদে পূর্ণ এমন এক রসসাগরের একত্র মিলন।

যাহা অসম্ভব, সেই গৌরাঙ্গলীলায় তাহাই ঘটিয়াছে।

এই শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনায় যেমন অপ্রাকৃত রসতৃষ্ণা জন্মিবে, দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইবে, তেমনি পরম-আনন্দরস-তৃষ্ণার তৃপ্তি যোগাইবে। ভক্তিলোলুপ সজ্জনগণের, রস-পিপাসু ভক্তজনের পরম আশ্রয় এবং পরম উপায় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

মহানুভবগণ সকলে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে কেমন দেখিতেছেন, কেমন ভালবাসিতেছেন, তাহা আস্বাদ করিবার ও করাইবার জন্য, তাঁহাদের লেখনীপ্রসূত অভিব্যক্তি সকলের আনন্দদায়ক হইবে; তাই সেই লেখাগুলি প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব পূর্ত্তি উৎসবের 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হইল।

অনুষ্ঠান সূচী অনুসারে পাঠবাড়ী আশ্রম কর্তৃপক্ষ উক্ত উৎসবকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা সেই চেষ্টাকে সফল করুন ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপার কাছে প্রার্থনা।

সাধুর মুখে শুনিয়াছি তাঁহার কৃপায় পাত্রাপাত্র বিচার নাই। সেই লোভে উৎসবের অনুষ্ঠান-উদ্‌যোগ।

গৌরভক্তগণের কৃপানুগামিনী গৌরাঙ্গ-সুন্দরের কৃপা। তাই রসরাজ মহাভাবের মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণারবিন্দের যাঁহারা মধুপ-সদৃশ হয়ে তাঁহার পাদপদ্ম-মধুপারে রত আছেন, তাঁহাদের কৃপাকণা ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই। তাঁহাদের কৃপাই উৎসব উদ্‌যাপিত করিবে ইহাই ভরসা। ইতি

কৃষ্ণানন্দ দাস

পাঠবাড়ী

স্মরণিকা সূচীপত্র

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের শ্রীশ্রীনিতাই গৌর মন্দিরের চিত্র ও

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের প্রবেশ পথ

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম—বাবাজী শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস (পঞ্চতীর্থ)

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীনিতাই গৌরের চিত্র।

বাণী—মাননীয় রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং

,,—মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী

,,—মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

,,—মাননীয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দ

ভাবাবেশে উপবিষ্ট শ্রীগৌরের চিত্র।

১। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অবদান—ডঃ রাসগৌর ঘোষাল ১

২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—চন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫

৩। অবতার নাহি কহে আমি অবতার—সত্যদাস মঙ্গল ৯

৪। বাসনা পূর্ত্তি লীলা—রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে ভজনস্তর—ডঃ বাসন্তী চৌধুরী ২০

৬। চৈতন্যগুরু শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ ২৪

৭। মহাবিপ্লবী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব—শ্রীসমরেন্দ্র চন্দ্র দেব ২৭

৮। শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণে—অমিতাভ চৌধুরী ৩০

৯। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য—কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর পাঠের সংকলন, ৩২

১০। কলিযুগোচিত উপাসনা—বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী ৩৭

১১। ভারত চেতনায় বিপ্লবায়নে শ্রীচৈতন্য—ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী ৩৯

১২। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রেমদানলীলা—শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী ৪২

১৩। মহাজনের দর্শনে শ্রীচৈতন্যদর্শন—শ্রীক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্ত্তী ৪৪

১৪। রসিক শেখর শ্রীগৌরাঙ্গ—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ৪৮

১৫। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত ৫৩

১৬। পরম ভাগবত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—রবিন রাহা ৬২

১৭। মধুরের সওদাগর—আশিস কমল সরকার ৬৬

১৮। সে হয় আমার প্রাণ রে—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৬৮

১৯। আমার জীবনে শ্রীচৈতন্যের কৃপাসূত্র—শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর ৭১

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের শ্রীশ্রীনিতাই গৌর মন্দির

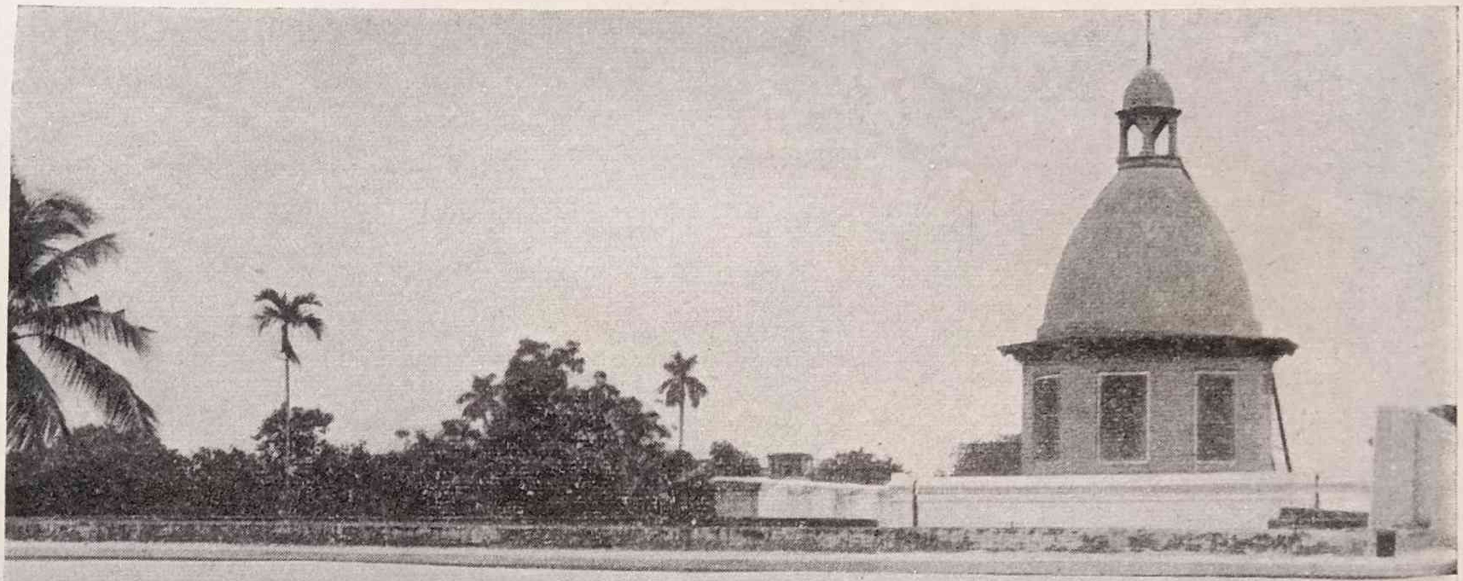

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের প্রবেশ পথ

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম

বাবাজী শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস (পঞ্চতীর্থ)

বরাহনগর গঙ্গাতট নিকটবর্ত্তী মালীপাড়া পাঠবাড়ী লেনে এই আশ্রম অবস্থিত। স্থানটি অতি পবিত্র। শ্রীল রঘুনাথ উপাধ্যায় নামে এক পরম ভক্তের আকর্ষণে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ঐস্থানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহাতীর্থ জ্ঞানে বৈষ্ণবগণ এই স্থানটিকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ মহাত্মা নামাচার্য্য শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের অধিগ্রহণের ফলে এই স্থানের মহিমা জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

সে আজ পাঁচশত বৎসর আগেকার কথা। রঘুনাথ উপাধ্যায় নিষ্কিঞ্চন হইয়া এখানে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া ভজন সাধন করিতেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করিতেন। তিনি ভাগবতে ছিলেন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত। প্রায় ১৪৩৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার কুটিরে আসিয়া তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া তিন প্রহর অবিশ্রান্তভাবে নৃত্য করেন এবং আনন্দিত হইয়া "ভাগবতাচার্য্য" এই উপাধি তাঁহাকে প্রদান করেন। তাঁহার নিকট তিনদিন অবস্থানের পর নিজের পাদুকা যুগল তাঁহাকে প্রদান করিয়া নীলাচলাভিমুখে গমন করেন। যাইবার কালে—

প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
এতেক তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সবে করিলেন মহা হরি হরি ধ্বনি॥

আজও শ্রীপাঠবাড়ী মন্দিরে এই রঘুনাথ উপাধ্যায় পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত সেবিত হইতেছেন মহাপ্রভুর সেই পাদুকাযুগলসহ।

"শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী" নামে শ্রীমদ্ভাগবতের অতিসুন্দর সম্পূর্ণ দ্বাদশস্কন্ধাবধি পদ্যানুবাদ ভাগবতচার্য্য রঘুনাথ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। অধুনা তাহা মুদ্রিত হইয়া ভক্তগণের অতি আস্বাদ্য হইয়াছেন।

ভাগবতাচার্য্যের তিরোধানের পর তাঁহার দেহ মহাপ্রভুর সেই নৃত্যভূমিতে সমাধিস্থ করা হয়, তাঁহার এক যোগ্য শিষ্য কর্তৃক পুনশ্চ তাঁহারি আদেশক্রমে তাঁহার সেই শিষ্য ভাগবতাচার্য্য সেবিত এক শালগ্রাম শিলা, এক মূর্ত্তি গোপাল এবং শ্রীমদ্ভাগবত (যাহা মহাপ্রভু শুনিয়াছিলেন) আর মহাপ্রভুর পাদুকা ঐ সমাধিস্থানে সমাধিস্থ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলিয়া যান। তাহার পর এ স্থান নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও একটি পুষ্করিণী এবং সেই পুষ্করিণীর ধারে দুইটি নিম্ববৃক্ষ ভাগবতাচার্য্যের স্মৃতি বহন করিয়া থাকে। পরিশেষে ঘোর জঙ্গলে পরিণত হইয়া ডাকাতদের আড্ডা হয়।

প্রায় একশত বৎসরের পর শ্রীকালী প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী নামে এক ধনী ব্রাহ্মণ অম্লশূল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বাবা তারকনাথের কৃপাদেশে এই স্থানের আবিষ্কার করতঃ প্রোথিত বস্তুর পুনরুদ্ধার, এই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ এবং নিম্ববৃক্ষ যুগলের দ্বারা "নিতাই-গৌর" যুগল মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া উক্ত মন্দিরে উঁহাদের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক উক্ত শালগ্রামাদিসহ উহাদের সেবা প্রকাশ করিয়া ব্যাধিমুক্ত হন এবং এই স্থানের নাম রাখেন শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের পাঠবাড়ী। আজও সেই নিতাই-গৌর বিগ্রহ ও উপরোক্ত শালগ্রাম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদুকাদি শ্রীপাঠবাড়ী মন্দিরে সেবিত হইতেছেন।

তারপর কালক্রমে বহুজনের হাতে এই পাঠবাড়ীর সেবা ভার হস্তান্তরিত হওয়ার পর ১৩৩৪ সালে এই

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম

পাঠবাড়ী নামাচার্য্য শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের হাতে আসেন তদবধি এই পাঠবাড়ীর অপূর্ব্ব শ্রী বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিশেষ উল্লেখ্য এই শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে শ্রীশ্রীভগবৎ ও ভাগবতগণের সুচারু সেবা, নিত্য নৈমিত্তিক বিভিন্ন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান ও অখণ্ড শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছেন এবং শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট গ্রন্থাগার, ধর্ম্মীয় সংগ্রহশালা ও শ্রীশ্রীভাগবত চতুষ্পাঠী নামে একটি টোল আছেন। শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর নামে একটি মাসিক পত্রিকাও অদ্যাবধি প্রকাশিত হইতেছেন। ইহা ছাড়া হোমিও-প্যাথিক-এলোপ্যাথিক দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। উক্ত গ্রন্থাগারে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রাচীন মনীষীবৃন্দের প্রতিকৃতি চিত্র, তাঁহাদের ব্যবহৃত দ্রব্য ও বিভিন্ন তীর্থের রজ, বারি স্মৃতি প্রভৃতি অতি সযত্নে রক্ষিত আছেন। বৈষ্ণব-দর্শন, হরিনামামৃত ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়নের সুব্যবস্থা আছে। এক কথায় শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম এক মহান তীর্থভূমি ও জনকল্যাণকর হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীপাঠবাড়ী শ্রীমন্দিরের শ্রীশ্রীনিতাই গৌর
(১৩৩৪ সাল হইতে শ্রীলরামদাস বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক সেবিত)

MESSAGE

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति का उप प्रेस सचिव

Deputy Press Secretary to the President

No.F.2-M/86

राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली-110004.

President's Secretariat
Rashtrapati Bhavan
New Delhi-110004

January 1, 1986

Dear Shri Das,

Please refer to your letter dated the 3rd December, 1985. The President of India is glad to know that the 500th year birth celebration of Shri Chaitanya Mahaprabhu will be held at Sri Pathbari Ashram, Calcutta, from January 17-26, 1986. The President sends his greetings and best wishes on the occasion.

Yours sincerely,

(Tarlochan Singh)

Shri Madhu Sudan Das,
Ashram Adhaskhya,
Sri Pathbari Ashram,
Calcutta-700035

MESSAGE

PULOK CHATTERJI
DEPUTY SECRETARY

प्रधान मंत्री कार्यालय
नई दिल्ली-110011
PRIME MINISTER'S OFFICE
NEW DELHI-110011

No. PMP-546

Dated: 17-12-1985
18

Dear Shri Das,

The Prime Minister sends his good wishes for the 500th birth anniversary celebrations of Shri Chaitanya Mahaprabhu being held at Sri Pathbari Ashram from 17th to 26th January, 1986.

With regards,

Yours sincerely,

Chatterji

(Pulok Chatterji)

Sh. Madhu Sudan Das,
Sri Pathbari Ashram,
Calcutta-700 035.

प्रधान मंत्री कार्यालय
नई दिल्ली-110011
PRIME MINISTER'S OFFICE
NEW DELHI-110011

[illegible]
[illegible] SECRETARY

D.O. No. [illegible]

Dated: 17-12-1995

Dear Shri Das,

The Prime Minister sends his good wishes for the 200th birth anniversary celebrations of Kavi [illegible] being held at [illegible] from 17th to 19th December, 1995.

With regards,

Yours sincerely,

([illegible])

Shri Madhu Sudan Das,
[illegible]
[illegible]

MESSAGE

PRIVATE SECRETARY
TO THE CHIEF MINISTER
WEST BENGAL

জানুয়ারী, ১৯৮৬

শ্রী ব্রজগোপাল দাস বাবাজী,
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম,
বরাহনগর,
কলিকাতা - ৩৫ ।

মহাশয়,

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পঞ্চশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ পত্র মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছেন । বিশেষ জরুরী কর্মসূচি থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে ১৭ই জানুয়ারী আপনাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে না । এজন্য তিনি দুঃখিত ।

তিনি আপনাদের অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেছেন ।

ভবদীয়,

মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব

RAMAKRISHNA MATH
P.O. Belur Math, DT. Howrah
January 2, 1986

Phone : 66-3619

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত বর্ষ পূর্তি আবির্ভাব উৎসব শ্রীপাঠবাড়ীতে আগামী মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত হবে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবৎপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল আদর্শে এই ধরাধামকে প্লাবিত করে অগণিত নরনারীকে শান্তিময় ভাগবত জীবন যাপন করতে প্রেরণা দিয়েছেন এবং আজও দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পদরেণুমন্ডিত শ্রীপাঠবাড়ীতে যেখানে আজও তাঁর স্বহস্তে লেখা পুঁথি, শ্রীচরণে ব্যবহৃত পাদুকা ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত আছে, সেখানে তাঁর পঞ্চশত বর্ষ আবির্ভাব উৎসব তাঁরই কৃপায় সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হোক এই প্রার্থনা।

আমি এই পবিত্র উৎসবে যোগদানকারী সকলকে আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছাদি জানাচ্ছি।

—ইতি

শুভানুধ্যায়ী

(স্বামী গম্ভীরানন্দ)

অধ্যক্ষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও

রামকৃষ্ণ মিশন

খালসা
২৪২,
জেলা মথুরা

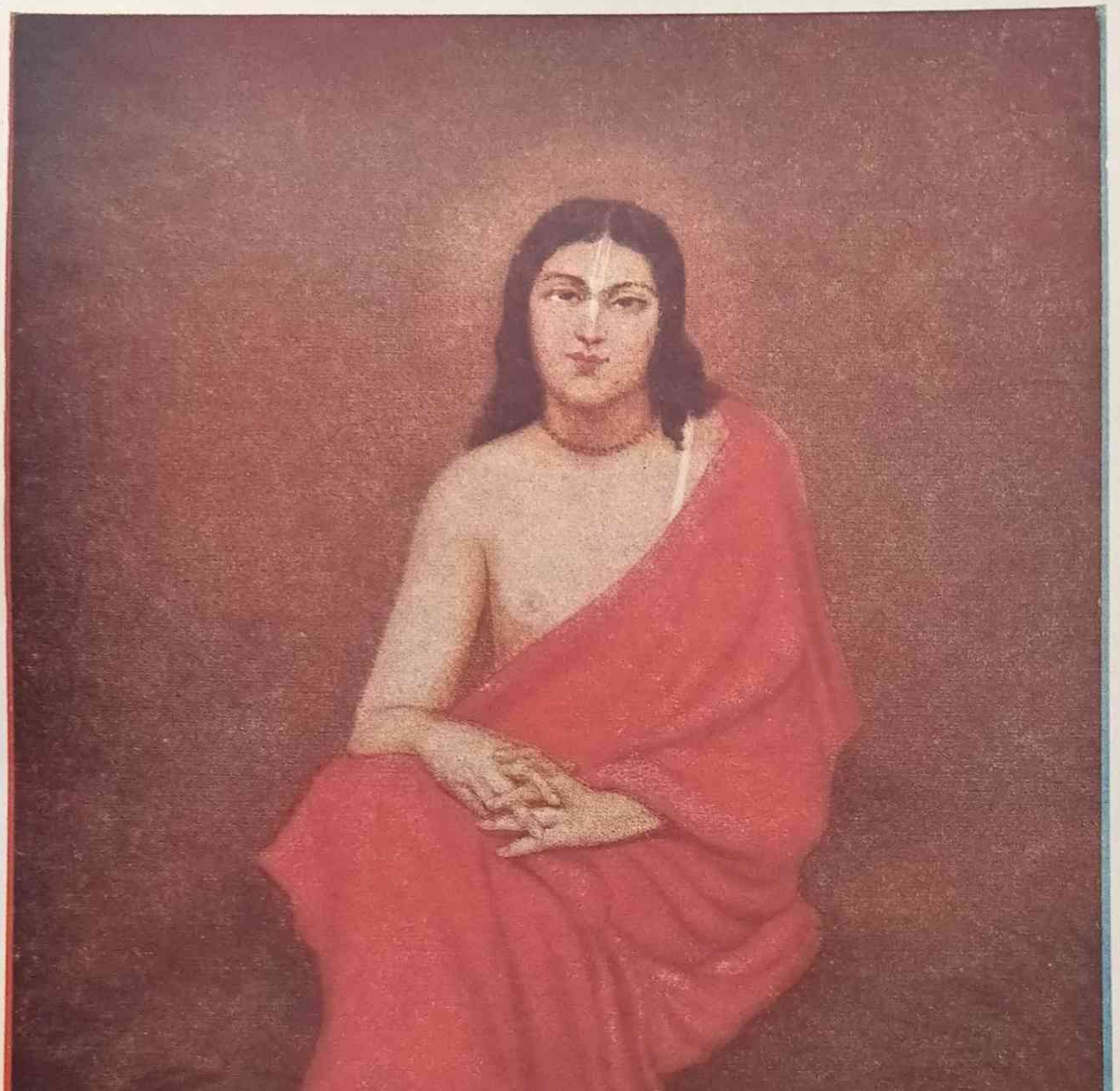

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অবদান

ডঃ রাসগৌর ঘোষাল

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

বর্তমান কলিযুগের অব্যবহিত পূর্বের দ্বাপর যুগে (বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি দ্বাপর যুগের শেষভাগে) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরামণ্ডলে জন্মলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্মরক্ষা এবং অধর্মের বিনাশ ছাড়াও তিনি বহু লীলা ব্রজে এবং মথুরা ও দ্বারকায় আস্বাদন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি জীবের প্রতি যে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং যাহা সর্বদেশের এবং সর্বকালের মানুষের পক্ষে অমৃত-স্বরূপ তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ। শ্রীমহা-ভারতের অংশ হইয়াও ইহা উপনিষদ্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

লীলা সংবরণের পর শ্রীকৃষ্ণও নিত্যধামে অবস্থিত হইয়া দেখিলেন যে জীব তাঁহার চরম উপদেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৫ ও ৬৬ শ্লোকে—মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

ভগবানের এই উপদেশ মানুষ ধারণা করিতে পারে নাই। সেইজন্য ঐ উপদেশের সার্থক রূপায়ন করিয়া জীব-শিক্ষার জন্যই মাত্র সাড়ে চার হাজার বছরের মধ্যেই তিনি ভক্ত সাজিয়া ঐ উপদেশ অনুসারে সাধন করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে এত শীঘ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ ॥"

নিজে আচরণ করিয়া না দেখাইলে শুধু মুখে উপদেশ দিলে জীব বুঝিতে পারিবে না তাই "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়," অবশ্য তিনি নিজেও এই লীলায় বিশেষ রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর করচায় বর্ণিত হইয়াছে—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী- গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

পদকর্ত্তা বলরামদাস শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলিয়াছেন ঃ—

কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি করিব না পাইয়া ওর ॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে, তোঁহারি স্বরূপ বিনে,
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করব উদয় ॥

সকলকে প্রেমদান ও সর্বজীব উদ্ধার ঃ—শ্রীগৌর-কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন "সর্ব জীব উদ্ধারের" ইচ্ছা লইয়াই। নীলাচলে একবার তিনি গৌড়ীয় ভক্তদের তাঁহার নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। অন্যান্য ভক্তরা মনোমত বর প্রার্থনা করিবার পরও শ্রীবাসুদেব দত্ত কোন প্রার্থনা করিলেন না। তখন মহাপ্রভু পুনরায় বলাতে তিনি বলিলেন—

"জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে ॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ ॥
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিল।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিল ॥
তোমার এ চিত্র নহে তুমি ত প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥

কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ত্তি বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥"

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা)

কিন্তু বাসুদেব দত্তর এই প্রার্থনার বহু পূর্বেই শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বজীব উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা লইয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু যে যুগে ত্রিপাদ পাপ, মাত্র এক পাদ পুণ্য মানুষের আয়ু কম, ইন্দ্রিয় সকল প্রায় সম্পূর্ণ বহির্মুখ, মানুষ কামক্রোধ ইত্যাদির দাস ও ভজনবিমুখ, তাদের কি করিয়া উদ্ধার করা যায়? তাই এক অদ্ভূত কৃপাভঙ্গি প্রকাশ করিলেন। পাপী পুণ্যাত্মা নির্বিশেষে যে তাঁহাকে দর্শন করিবে তাহারই প্রেমলাভ হইবে। শুধু তাহাই নয়, সেই প্রেমপ্রাপ্ত মানুষকে যে দর্শন করিবে তাহারও প্রেমলাভ হইবে। শ্রী কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছিলেন— "কৃষ্ণপ্রেম হয় যার দূরে-দরশনে" সে সময় অপরাধেরও বিচার করেন নাই। ভগবানের এইরূপ কৃপা ব্রহ্মার এই দিনে কোন মন্বন্তরে বা কোন যুগে কেহ দেখে নাই কিংবা কোন ভগবৎ স্বরূপেও তিনি করেন নাই। শ্রীবাসের গৃহে শচীমাতার অপরাধ সম্বন্ধে যে কথা তিনি বলিয়াছিলেন তাহা বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ কালের জীবকে সাবধান করাইবার জন্য। শ্রীপ্রকাশানন্দ উদ্ধারের ব্যাপারে কাশীর মহারাষ্ট্রী বিপ্র অনুভব করিয়াছিলেন যে মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেই প্রকাশানন্দের হৃদয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে। সেইজন্যই তাঁহাদের দুজনকে একত্রিত করিবার জন্য তাঁহার এইরূপ আকুলতা ও চেষ্টা।

(চৈঃ চঃ আদি সপ্তম)

নাম আশ্রয় এবং নাম সংকীর্ত্তনের উপদেশঃ

কলিযুগের যুগধর্ম—হরিকীর্ত্তন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

কলিযুগের যুগাবতারের কার্য্য হরিকীর্ত্তন প্রচার করা। কিন্তু এই কলিতে স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"স্বয়ং ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে"॥ (চৈঃ চঃ)

সেইজন্য এই কলিতে মহাপ্রভুই কীর্ত্তন—কলির যুগধর্ম—প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও কলিসন্তরণ-উপনিষদে উপদিষ্ট মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

জপ এবং কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে পূর্ববঙ্গে যাইয়া অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত তপনমিশ্রকে (রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতৃদেবকে) এই মহামন্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন। শাস্ত্রমতে এই মন্ত্র বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর সকলের পক্ষে গ্রহণীয়। এই মন্ত্র জপের দ্বারা সুরাপায়ী মহাপাতকীও পাপ হইতে উদ্ধার পাইবেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসাগমমতেষু চ।
মীমাংসা-বেদবেদান্ত-বেদাঙ্গেষু সমীরিতম্॥

অর্থাৎ এই নামের মহিমা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, আগম, মীমাংসা, বেদ, বেদান্ত এবং বেদাঙ্গে কীর্ত্তিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্য-চরিতামৃতে এই মন্ত্রের উল্লেখ করেন নাই।

সাধারণ লোকের ধারণা এই মহামন্ত্র সরল বাংলা ভাষায় লিখিত, ইহাতে কোন অনুস্বার বা বিসর্গ নাই, সুতরাং ইহা কিরূপে সংস্কৃত ভাষা হইতে পারে? কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শ্রীকৃষ্ণের তিনটি নাম সম্বোধন বিভক্তিতে কৃষ্ণ, রাম ও হরে হয়। মহাপ্রভুর উপদেশ কৃষ্ণকে এই তিন নামে আহ্বান করা। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী লিখিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতিবর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥

ইহা দ্বারা ভগবানকে কেবল আহ্বান করা হইতেছে। ইহাতে কোন প্রার্থনা নাই। শুদ্ধা ভক্তির সাধক মনে করেন, আমি কি প্রার্থনা করিব, আমার প্রকৃত মঙ্গল কিসে হইবে তাহা আমি জানিনা। আমি কেবল আকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারি। তাঁহার মনোভাব—

"বুদ্ধির্বিকুণ্ঠিতা নাথ, সমাপ্তা মম যুক্তয়ঃ।
নান্যৎ কিঞ্চিৎ বিজানামি, ত্বমেব শরণং মম"॥

আজকাল ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই মন্ত্র গীত হইয়া থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তরা কলিসন্তরণোপনিষদে উক্ত "হরে রাম" এই পদগুলি আগে উচ্চারণ করেন। কিন্তু সমস্ত মন্ত্রটী বারবার উচ্চারিত হইলে আগে ও পরে কোন ভেদ থাকে না।

পদ্মপুরাণে উল্লিখিত—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বাৎ নামনামিনঃ॥
নামীর অপেক্ষা নামের কৃপা অধিক।
বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ম্
পূর্বস্মাৎ পরমেব হন্ত! করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি।

হে নাম! বাচ্য অর্থাৎ বিভুচৈতন্যাত্মক বিগ্রহ এবং বাচক অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ, রাম ইত্যাদি বর্ণাত্মক আপনার দুইটি স্বরূপ এই জগমণ্ডলে শোভা পাইতেছে; কিন্তু আমি ঐ বিভুস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপকেই সদয় বিবেচনা করি কারণ প্রাণী বিভুস্বরূপে কৃতাপরাধ হইয়া বাচকস্বরূপে নামোচ্চারণরূপ উপাসনামাত্রই নিরপরাধ হইয়া সর্বদা আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে—
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"॥

এই শ্লোক প্রভুই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি পথে আনয়ন করেন। হতভাগ্য কলিজীবের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ আনন্দভরে বলিয়াছেন—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥

প্রভুর নিকট ভক্তের জাতিদোষ নাই। শাস্ত্রের কথা—
চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।

অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হরিভক্ত পরায়ণ চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু ইহা অক্ষরে অক্ষরে মানিতেন। হরিদাস সিদ্ধবকুল তলায় রূপগোস্বামীর নিকট রহিয়াছেন। প্রভু হরিদাসকে দেখিতে আসিবামাত্র হরিদাস প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন—"হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥" (চৈঃ চঃ)

প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পথে কাশীতে আসিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। সনাতন গোস্বামী গৌড় হইতে কাশী গিয়া চন্দ্রশেখরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সর্বজ্ঞ প্রভু চন্দ্রশেখরকে বৈষ্ণব সনাতন গোস্বামীকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সনাতন বহুদিন ক্ষৌরি হন নাই, স্নান করেন নাই, গায়ে ভোটকম্বল জড়ান এবং হাতে এক করোয়া। চন্দ্রশেখর আসিয়া প্রভুকে বলিলেন, দ্বারে এক মুসলমান দরবেশ (ফকির) বসিয়া আছে, কোন বৈষ্ণব নাই। প্রভুর আদেশে তাঁহাকেই ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। সনাতন প্রবেশ করিবামাত্রই প্রভু দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইল সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ কহে গদগদ বচন॥"

বাহির দাওয়ায় দুজনে বসিলেন এবং প্রভু
"স্বহস্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জন।
তেঁহ কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিবলে তুমি পার ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥" (চৈঃ চঃ)

সংকীর্ত্তনের স্থানে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি। "দৈন্যমূলা হি ভক্তিঃ"। জাতির অহংকার লইয়া ভক্তির সাধনা হয় না। মহাপ্রভুর মনের ভাবই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"এই সে বৈষ্ণবধর্ম, সবারে প্রণতি।"

বাঙ্গালীর ভাষা ও সংস্কৃতিঃ—বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাভাষী লোকের একতা মহাপ্রভুই প্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন। সুদূর চট্টগ্রাম হইতে গদাধর গোস্বামী, মুকুন্দ দত্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতিকে, শ্রীহট্ট হইতে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতিকে (তাঁহারও পৈতৃক বাসস্থান শ্রীহট্ট), উত্তরবঙ্গ হইতে রূপসনাতনকে, পশ্চিমে বীরভূম হইতে নিত্যানন্দ প্রভুকে, এইরূপ বিভিন্ন স্থানের ভক্তকে তিনি একত্রিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ তাঁহার সময় হইতেই আরম্ভ হয়।

বাংলাভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজার লাইব্রেরী হইতে আবিষ্কার করেন। কিন্তু সাধারণ আমরা ইহা বাংলা ভাষা বলিয়া বুঝিতে পারি না। ইহা দশম বা একাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ। তারপর বাংলায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য, মালাধর বসুর (গুণরাজ

খাঁ) শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে। কিন্তু মহাপ্রভুর সময় হইতেই বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করিয়া পদাবলী সাহিত্যের বিস্তৃতি ও উন্নতি হইতে থাকে। সেই সময় হইতেই বাংলাসাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রভৃতির মূলপত্তন ও বিস্তার আরম্ভ হয়।

ভারতীয় বৈষ্ণবদর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বাঙ্গালীর অবদান ঐ সময় হইতেই আরম্ভ হয় এবং মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামীত্রয় অসংখ্য গ্রন্থ লিখিয়া মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন।

সাম্য, মৈত্রী ও সমন্বয়বাদ ঃ—মহাপ্রভুর মতানুসারে সাম্য মৈত্রীর মূলও পারমার্থিক। শুধু মানুষে মানুষে নয়, প্রত্যেক জীবের সহিত সাম্যের এবং মৈত্রীর কথা মহাপ্রভু বলিয়াছেন। এই স্থূলদেহে—তাহা মানুষ, পশু কীটপতঙ্গ বা উদ্ভিদ যাহাই হউক না কেন—সকলের মধ্যেই এক প্রকারই জীবাত্মা রহিয়াছেন।

বেদ পুরাণোক্ত সমস্ত ভগবত্তত্ত্বেরই সেবা দ্বারাই জীব তাঁহাকে পাইতে পারে ও মুক্তি লাভ করে। বেদ শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ মতকে তিনি স্বীকার করেন নাই। মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার ভিন্নতা এবং অধিকার ভেদ মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিই একমাত্র পরম মঙ্গলের পথ বলিয়াছেন এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের পারমার্থিক সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভু শঙ্করের এই সাযুজ্যমুক্তি অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের শ্লোক—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥

ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তগণ চিন্ময়ধাম বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে আবরণরূপ চিন্ময় সিদ্ধলোক তাহাতে অবস্থান করেন। ভগবান কপিলদেবের উক্তি—

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য স্বারূপৈকোত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

মহাপ্রভুর মতে জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস ও অংশ; দাসের কর্তব্য প্রভুর সেবা এবং অংশের কর্তব্য অংশীর সেবা। অতএব জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময়ী সেবা এবং এইরূপ সেবালাভই মহাপ্রভুর হার্দ্য। কিন্তু তাহা হইলেও অন্য আচার্য্যগণের সাধন প্রকার ও মুক্তির অবস্থা—তাহা যদি শ্রুতিস্মৃতির অনুগত হয়—তিনি তাহা অস্বীকার করেন নাই। শ্রীরামানুজস্বামী বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবালাভই মুক্তি বলিয়াছেন। তিনি শঙ্করের নির্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ, নিঃশক্তিক ব্রহ্ম স্বীকার করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম কর্মমার্গের ও বেদবিহিত জ্ঞানমার্গের উপাসক তাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন তাহা মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক—যেমন শ্রীমুরারি গুপ্ত ও শ্রীরূপগোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপম—তাঁহারাও নিত্যধামে শ্রীরামচন্দ্রের সেবালাভ করিবেন। এইভাবে শ্রুতি-স্মৃতি অনুগত বিভিন্নভাবের সাধন ও বিভিন্নভাবের মুক্তিলাভ মহাপ্রভু স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যদিও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মঞ্জরীভাবে সেবালাভই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই শ্রুতি-স্মৃতি অনুগত সাধ্য এবং সাধনের সমন্বয় পূর্বে কেহই করেন নাই। লোকের বিভিন্ন রুচি। সেইজন্যই মুক্তির এই বিভিন্ন পথ। মহাপ্রভু বেদানুগত সকল মতই স্বীকার করিয়াছেন, বেদবিরুদ্ধ কোন মতই স্বীকার করেন নাই।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

"এই বঙ্গদেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসূতি"

—শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশ্যে কীর্ত্তনাদি করার অধিকার থেকে হিন্দুরা বঞ্চিত ছিলেন।

মহাভারতে আছে বকরূপী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল— 'কঃ পন্হা' অর্থাৎ পথ কী? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—

বেদাঃ বিভিন্না স্মৃতয়োর্বিভিন্না।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং॥
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্হা॥
(ভিন্ন ভিন্ন বেদ আর স্মৃতি শাস্ত্র হয়।
ভিন্ন ভিন্ন মুনিগণ ভিন্ন মত কয়॥
ধর্ম্মতত্ত্ব আছে যত নিহিত গুহাতে।
সেই পথ, মহাজনে যান যেই পথে॥)

অর্থাৎ বিভিন্ন বেদ আছে, বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রও আছে, নানা মুনিরও নানা মত। ধর্ম্মের যে তত্ত্ব তাও গভীর গহ্বরে নিহিত আছে, অতএব সেইটিই হচ্ছে পথ যে পথে মহাজনেরা সকলে গিয়েছেন।

এওত' এক দুরূহ ব্যাপার। সব মহাজনও ত' একই পথে যান নি। তাঁদের মধ্যেও ত' বিভিন্ন জনে বিভিন্ন পথের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। মুনিদের মধ্যে যেমন মতভেদ আছে, তেমনি মহাজনদের মধ্যেও ত' পথভেদ আছে। তাহলে সাধারণ মানুষ কোন্ পথ বেছে নেবে? যুধিষ্ঠিরের উত্তরেও কিন্তু সুরাহা কিছুই হল না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
(হে ভারত! ধর্ম্ম যবে হইবে পতিত।
অধর্ম্ম উঁচাবে মাথা হয়ে হরষিত॥
তখনি বুঝিবে এবে হয়েছে সময়।
নিজেরে সৃজিব আমি জানিহ নিশ্চয়॥
সাধুগণে পরিত্রাণে দুষ্কৃতে দমিতে।
যুগে যুগে জন্ম নিব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতে॥)

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগে হিন্দুশাস্ত্রমতে ঈশ্বর আরাধনার ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥
(সত্যযুগে ধ্যান আর ত্রেতাযুগে যজ্ঞ।
দ্বাপরে অর্চ্চনাদ্বারা যাহা লভে বিজ্ঞ॥
কলিযুগে তাহা পায় অন্য পূজা বিনে।
শুধুমাত্র কেশবের নাম সংকীর্ত্তনে॥)

আর বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
(হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর॥)

এবং শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনম্॥
(সত্য যুগে বিষ্ণু পূজা করয়ে ধ্যানেতে।
ত্রেতা যুগে যজ্ঞে পূজা করে শুদ্ধ চিতে॥
দ্বাপরেতে পূজা করে পরিচর্য্যা দিয়া।
কলিযুগে পূজে হরি কীর্ত্তন করিয়া॥)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শাস্ত্রমতে হরিনাম—কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই কলিযুগে ভগবদারাধনার একমাত্র পথ ও কলিহত জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—

কলের্দোষনিধেরাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
(দোষ সিন্ধু কলিযুগের, শুনহ রাজন্।
সর্ব্বদোষ ঢাকিয়াছে এক মহাগুণ॥
কৃষ্ণকীর্ত্তনেতে করি বন্ধনের ক্ষয়।
পরম ধামেতে যায় হইয়া নির্ভয়॥)

পথের হদিশ ত' পাওয়া গেল, কিন্তু এই পথের দিশারী কই? মুসলমান শাসিত রাজ্যে নাম সংকীর্ত্তনের অধিকার থেকে ত' হিন্দুরা বঞ্চিত। কে তাদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে? চাঁদ কাজীর আদেশে, হরিনাম-কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন অর্থাৎ কলিযুগে ভগবদারাধনার একমাত্র পথ ও কলিহত জীবের বন্ধনমুক্ত হয়ে পরমধামে যাবার একমাত্র উপায়, চাঁদ কাজীর রাজ্যে নিষিদ্ধ। কে এই বন্ধ পথ উন্মুক্ত করে দেবে? কে এই অন্যায় আদেশ অমান্য

করে, এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হরিনাম—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করবে এবং সকলকে করাবে? কোথায় সেই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আবির্ভূত হয়ে সাধুজনের পরিত্রাণ করবেন, চাঁদ কাজীরূপ দুষ্কৃতকে দমন করবেন এবং ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন?

শ্রীমদ্ভাগবতকে বলা হয় পঞ্চমবেদ। সেই পঞ্চম বেদে কিন্তু, এই অবস্থায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পথের দিশারীরূপে আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধ সঃ॥
(অকৃষ্ণ গৌরকান্তি মুখে কৃষ্ণ নাম।
অঙ্গের সৌষ্ঠব যাঁর ভূষণ সমান॥
অস্ত্র যাঁর সাথে ফেরে পার্ষদের দল।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে পূজে সুমেধা সকল॥)

মুখে কৃষ্ণনাম, গৌরকান্তি, সপার্ষদ ইত্যাদি, শ্রীমদ্-ভাগবতের এই উক্তি যে কাকে নির্দ্দেশ করছে, তা কি আর বলে দিতে হবে? তিনিই সেই যাঁর আবির্ভাবের কথা বিভিন্ন পুরাণে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শুধু পদ্মপুরাণের উক্তিটিই মনে হয় যথেষ্ট হবে—

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহং মহীতলে।
ভাগীরথি তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
(গৌরতনু ধরি, কলি যুগে ধরাতলে।
আবির্ভূত হব আমি এক সন্ধাকালে॥
সেইস্থানে মনোরম ভাগীরথি কূলে।
শচীর নন্দনরূপে আসিয়া ভূতলে॥)

শ্রীচৈতন্যদেব হরিনাম-কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন চাঁদ কাজীকে দমন করে। শ্রীচৈতন্য-দেবের মহিমায় এবং তাঁর বিরাটত্বের কাছে নতি স্বীকার করে চাঁদকাজী শুধুমাত্র তাঁর নিষেধাজ্ঞাই প্রত্যাহার করে নেন নি উপরন্তু নাম সংকীর্ত্তনের অবাধ অধিকারও দিয়ে-ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব কিন্তু ধর্ম্ম সংস্কারক ছিলেন না। যদিও তিনি ভগবদারাধনার এক নূতন পথের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন এবং সমবেত ভাবে ধর্ম্মাচরণের এক নতুন দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তৎকালীন বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও এনেছিলেন এক অভিনব আলোড়ন এবং হরিনাম কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে একত্ববোধ ও ভ্রাতৃত্ব। শ্রীচৈতন্যদেব বাংলা তথা ভারতের জনগণের মধ্যে এক নূতন ধর্ম্মচেতনার উন্মেষ করলেন, সমবেতভাবে হরিনাম সংকীর্ত্তন ও নগর সংকীর্ত্তনে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করলেন এবং সাথে সাথে এনে দিলেন হরিনাম কৃষ্ণনামের এক বন্যা।

সে সময় হিন্দুধর্ম্মের খুবই দুরবস্থা ও অধঃপতন ঘটেছে। বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রায় অবলুপ্ত। একদিকে ভ্রষ্টতান্ত্রিকগণ ও তাদের শিষ্য সামন্তেরা মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি নানারূপ প্রক্রিয়ার অনুশীলনে রত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নামে রুচি-বিকৃতি ও বহুবিধ অনাচারে লিপ্ত অপরদিকে সাধারণ মানুষ মঙ্গলচন্ডীপূজা ও বিষহরিপূজা প্রভৃতি অবৈদিক পূজাপার্ব্বণকে ধর্ম্মাচার বলে মনে করতো এবং তদুপলক্ষেও লৌকিকতা ব্যবহারিকতাতে অকারণ ও অনুচিত ব্যয় বাহুল্যে লিপ্ত থাকত। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপালন সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট পথ বা নির্দ্দেশ ছিল না এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে এসম্বন্ধে কোনো ধারণা বা চেতনাও ছিল না।

শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব যুগে বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ জন গণের মানসিকতার সঙ্গে বঙ্গদেশের প্রতিবেশী জনগণের মানসিকতার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলনা—এই মানসিকতা ছিল নিতান্তই অপক্ক ও বালসুলভ। শ্রীচৈতন্যদেবের বিরাট-ত্বের সান্নিধ্যে ও তাঁর বিশাল প্রভাবে তৎকালীন 'গৌড়ীয়া' জনগণ পেয়েছিল তাদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের বাঙালীত্ব। এই প্রভাব, এই স্বাতন্ত্র্য তাদের তৎকালীন প্রবচন 'তানিমানি বয়াংসি বঙ্গা' কে চূর্ণ করে ডিম ভেঙে বেরিয়ে পক্ষবিস্তার করে আকাশে উড়তে শিখিয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব বাংলার জনগণের মধ্যে চৈতন্যসঞ্চার করে তাদের শিখিয়েছিলেন মানুষ হতে।

শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব যুগে সব দেবদেবীর পূজার হেতু ছিল মূলতঃ প্রীতি এবং সে সঙ্গে হয়ত কিছুটা ভক্তি—তাও ভীতি প্রসূত। এই ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্ত্তন এনে-ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব—উন্মুক্ত করেছিলেন ধর্মসাধন ও ধর্ম্মাচরণের এক নব দিগন্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ধর্ম্ম এবং যার তিনি প্রবক্তা—তা'হল প্রেমধর্ম্ম। এই প্রেম ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণে প্রেম, এই প্রেম সর্ব্বাত্মক, আপামর চন্ডালে এবং সর্ব্বজীবে—কারণ জীব মাত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি।

বিশবব্রহ্মান্ডের সঙ্গে ব্রহ্মকে একীভূত করা হয়েছে

ছান্দোগ্যোপনিষদে—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলে, বৃহদারণ্যকোপনিষদে—'ইদং ব্রহ্মেদং সর্বং' বলে, এবং, অন্যান্য বহুভাবেই বলা হয়। কিন্তু এই সব উক্তি অত্যন্ত দুরূহ, সাধারণের মোটেই বোধগম্য নয়। ঐ একই কথা বললেন শ্রীচৈতন্যদেব কত সুন্দরভাবে যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে, উপলব্ধি করতে পারবে। শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাখ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের ভেদ অভেদ এই দুই প্রকারেরই প্রকাশ—যা অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব নামে খ্যাত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত শক্তির অধিকারী, তার মধ্যে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়িক শক্তি, এই তিনটি শক্তিই প্রধান। চিচ্ছক্তি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি আর মায়িক শক্তি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি। এই দুই শক্তির মাঝে তাঁর জীব শক্তির প্রকাশ জীব-মাত্রেই অবস্থিত। জীবশক্তির এক তটে চিচ্ছক্তি এবং অপর তটে মায়িক শক্তি—তাই জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—চিচ্ছক্তির সাথে সংযোগ থাকায় জীবের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভেদ প্রকাশ এবং মায়িক শক্তির সাথে সংযোগ থাকার ফলে জীবের মধ্যে তাঁর ভেদ প্রকাশ। এই দুই প্রকাশের সাধারণ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়—সূর্য ও কিরণ বা অগ্নি ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দিয়ে—অর্থাৎ সূর্যকিরণ সূর্যের অংশ হলেও যেমন সূর্য নয় বা অগ্নিস্ফুলিংগ যেমন অগ্নির অংশ হলেও অগ্নি নয়—কিন্তু তাঁরা সূর্যও বটে আবার অগ্নিও বটে—কারণ উত্তাপ বা দাহ্য শক্তি উভয়েরই আছে।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

* * * *

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ ॥
ওঁ জগন্নাথসুতং দেব, শচী গর্ভ-সমুদ্ভবম্।
বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদয়েশং বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ ॥

"তিনি (শ্রীচৈতন্য) গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন।...তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল, সকলের প্রাণে শান্তি দিল, তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, বেশ্যা পতিত সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল, সকলকেই তিনি দয়া করিতেন।... আজ পর্য্যন্ত উহা দরিদ্র, দুর্বল, জাতিচ্যুত পতিত, কোন সমাজে যাহার স্থান নাই, এইরূপ সকল ব্যক্তির আশ্রয়স্থল।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

অবতার নাহি কহে আমি অবতার

সত্যদাস মঙ্গল

শ্রীগুরু প্রেমানন্দে বল—'নিতাই গৌর হরি বোল', শুধু বললে হবে না, ভজ 'নতাই গৌর রাধেশ্যাম'। আর জপ 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥' একবার, আধবার নয়—অবিরাম ভজ আর জপ। ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ শ্রীরাধারমণের দেওয়া এই নাম ভজলে কারও কোন অভাব থাকবে না। অভাব মিটিয়ে স্বভাব জাগিয়ে দেবে, যদি বল —নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

সাধ্য- সাধন নির্ণয় করা এই নাম; আশ্রয় শ্রীমতী রাধিকা, বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—আশ্রয়-বিষয় হোড় (একাকার) করা ব্রজরস উদ্দিপ্ত হয় এই নামে—এমন গৌর-স্বরূপ জাগানো নামের প্রতিটি বীজ অনুভব করতে হবে-জপ করতে হবে—রাম রাম হরে হরে। এমনভাবে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' যদি জপতে পারা যায়, তাহলেই কাজ হবে ···বোঝা যাবে, এই নাম কেমন জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ রামকে রমণ করেছেন!

তাহলে সবাই একবার অন্তর মুখে বলি—'নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ শুধু মুখে বলতে পারলেই 'ভজ জপ' এর কাজ হয়ে যাবে—আমাদের পাগলা রাধারমণের নাম, সবাই বল অবিরাম—'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম'॥

'এই হরে কৃষ্ণ হরে রামই' কলিযুগের মূলমন্ত্র। এ কোন অনাপ্ত কথা নয়। হর্ষে প্রভু গৌরসুন্দর স্বরূপ-রাম রায়কে এ কথাই বলছেন। এ যে ঘোর কলিযুগ! এর থেকে নাম বিনা পরিত্রাণের অন্য কোন পথ খোলা নেই। এ কোন অসাধারণ জটিল পথ নয়—এলোমেলো গলি ঘুঁজিও নয়; বরং বলা যায়—একেবারেই সরল বিশ্বাসের পথ এ-মিথ্যা অহমিকা বিসর্জনের পথ; বাঁচার মত বাঁচাবার পথ একটাই—নাম করা।

শ্রীভগবানের নাম করতে করতেই ভগবৎ প্রেমের উদয় হয়ে থাকে। সেই প্রেমের প্রকৃত ধর্ম। কলিযুগোচিত নাম-সংকীর্তনের পথেই প্রেমেরই উদ্গম! অখিল রসের ধাম এই প্রেমেই নিহিত রয়েছে। বেদের নিগূঢ় মর্ম এখানেই পাওয়া যাবে। চারি বেদ—চৌদ্দ শাস্ত্র, আঠার পুরাণ-তন্ত্র-গীতা আদি মন্থন করে যে 'হরে কৃষ্ণ' নামের প্রকাশ ঘটেছে —ধন্য কলিকালে সে অপাংক্তেয় নয়। কলিহত জীবের পরম সৌভাগ্যবশে কোন প্রকার সংকীর্ণতা এই নামের মধ্যে থাকতে পারে না। যে নাম হতে, মহাপ্রভু পরম হর্ষভরে বলছেন,— পাপ-সংসার নাশ হয়, চিত্ত-শুদ্ধি ঘটে, সর্ব-ভক্তি-সাধনের উদয় হয়, কৃষ্ণপ্রেম—প্রেমামৃত আস্বাদন হয়, কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে—প্রাপ্তিতে সেবালাভ হয়, সেবামৃত সমুদ্রে জীব নিমজ্জিত হয়—সেই 'হরে কৃষ্ণ' নামে কি কোনও জারি-জুরি থাকতে পারে? বরং বলা যায়, অখিল রসের ধাম এই 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'।

যেই নাম সেই নামী—মুখে বলা সহজ; অনুভবে রপ্ত করা শক্ত। 'সন্দেশ' 'সন্দেশ' মুখে বললে কি সন্দেশ খাওয়ার তৃপ্তি আসতে পারে? প্রাকৃত জগতে নাম এবং নামী আলাদা। নামের কাজ প্রাকৃত জগতে নামী করতে পারে না, বা নামীর কাজও নাম সর্বদা করতে পারে না।

কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে নাম-নামী অভেদ। নাম যা পারে, নামীও তাই পারে—এবং বেশী পারে নাম, যা স্বয়ং নামীও পারে না। এই অভেদ নাম-নামী তত্ত্বে নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে অন্তরে ব্রজভাব উদ্দীপিত হবে···হৃদয়ে ব্রজরস বিগ্রহ রাধাশ্যাম মিলিত তনু গৌর-সুন্দর উদ্ভাসিত হবেন। তাই কথা উঠেছে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

নাম-নামী অভিন্ন জ্ঞানে নাম করতে পারলেই নামীকে পাওয়া যাবে—সাধ্য-সাধন নির্ণয় করা নাম, 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' জপতে জপতেই ব্রজ-প্রেমরসের আস্বাদন পাওয়া যাবে। নামদাতা শ্রীগুরু-আনুগত্যে হৃদয় উদ্বেলিত হবে। শ্রীনামাচার্য্য রামদাস তাই সবলকেই ডেকে বলছেন—'নাম-দাতা নাম এক জেনে, প্রাণ ভরে গাও ভাই—হা নিতাই! জয় নিতাই!···শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরে অনুভব কর ভাইরে—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ। যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টঃ তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥

(শ্রীভাগবত সন্দর্ভ, বামনকল্প, উত্তর খণ্ড, ব্রহ্মবাক্য।)

অর্থাৎ যিনি মন্ত্র, তিনিই সাক্ষাৎ গুরু। যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি। গুরু যাঁর প্রতি তুষ্ট হন, স্বয়ং হরি তাঁর প্রতি তুষ্ট হয়ে থাকেন।

মন্ত্রদাতা এবং মন্ত্র একই—নামই তো মন্ত্র; সুতরাং মন্ত্রদাতা যিনি, নামদাতাও তিনি। তাহলে, নামদাতা নাম এক। সে কারণেই ভক্ত সনাতন দাস বলছেন,—'জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি। ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি'! সেই নামদাতা শ্রীগুরুর চরণ দুটি হৃদয়ে ধারণ করে—'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নাম অহরহঃ জপ করতে পারলে তবেই নামী শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-কারুণ্য লাভ হতে পারে—

দেহে-মনে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ে তখন শুধু গৌরকথাই অনুভূত হবে—গৌর-বাণীই নিঃসারিত হবে; সদাই মনে হবে—'প্রেমসিন্ধু গোরা রায়' নিতাই তরঙ্গ যোগে কেমন উচ্ছলিত হয়েছে, অদ্বৈত করুণার বাতাস স্পর্শে কেমন উদ্বেলিত হয়েছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমবিকারের বারিময়, প্রেমসিন্ধু গোরা রায় হতে কেমন শত শত শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত সার ধারা বয়ে চলেছে নিরন্তর—দশদিকে!

নিরন্তর বহমানা প্রেমধারা দেখে আজ পাঁচশত বছর পরেও আমাদের বিশ্বাস কেমন অটুট রয়েছে—নিতাই তরঙ্গ সনে, অদ্বৈত করুণা-বাতাস পরশে—প্রেমসিন্ধু গোরারায়ের প্রেম এখনও কেমন উথ্‌লে পড়ছে—ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে, তোমাকে—এই স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতাকে।

কারণ, অদ্বৈত আহ্বানে প্রভু নিতাই প্রাণ নিতাই প্রাণ গৌরাঙ্গের মতো এমন পরম করুণ প্রেমদাতা পূর্বে কোনদিন হয়নি, পরেও কোনদিন হবে না। এই গৌর-প্রেমসিন্ধুতে আমরা সবাই ভাসছি। নিতাই-চৈতন্য দয়াময় আমাদের ভাসিয়েছে।

'প্রেমসিন্ধু গোরারায়ের প্রেম কেমন উথলিয়া ভাসায় রে!'—শুধু ভাষায় কেন বলি? তাপতৃষ্ণায় কাতর সকলকে প্রেম-জলে ডুবায়। জগতকে প্রেমজলে সিঞ্চিত করে প্রেমসিন্ধু গোরারায়! আর তাতে জন্ম-জন্মান্তরের যত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক তাপ, যত আধি-ব্যাধি-ক্লেশ, যত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-তৃষ্ণা নিবারিত হয়, তাঁরই পরম করুণায়।

এমন পরম করুণ প্রেমদাতা, তাই হয়নি আর হবার নয়। তাইতো শাস্ত্রে-সাধু বাক্যে শ্রীগুরু-উপদেশে প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরাঙ্গ হলেন বড় অবতার। সব অবতারের অবতার—অবতারী শুধু নয়; সর্বাবতারী। এমন সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'বড় অবতার' কেন বলা হয়? কেন মহাপ্রভু স্বয়ংই সনাতন গোস্বামীকে বলছেন,—'অবতার নাহি কহে—আমি অবতার'—কারণ—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

(শ্রীল রূপ গোস্বামিকৃতস্তবমালাঃ ২য় স্তব-৩য় শ্লোক)

শ্রীরাধা প্রেম-লম্পট শ্যামসুন্দর শ্রীশ্রীমতী রাধিকার অনির্বচনীয় মধুর প্রেমরস রাশি হরণ করে, স্বয়ং সেই প্রেম উপভোগের জন্যই, ইহ জগতে এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়েছেন। শ্রীরাধার প্রেম চুরি করে নিজ দেহে সেই শ্রীরাধার কান্তি প্রকট করে স্বীয় শ্যাম কান্তিকে যিনি আচ্ছাদিত করেছেন সেই সাতিশয় কৃপাপ্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে পরমকরুণাভরে কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন·· শ্রীল সনাতন গোস্বামিকে মহাপ্রভু যেন বলছেন,—শুন সনাতন! রসের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে (রসস্তোমং হৃত্বা) যে চোর দেশ ছাড়া হয়েছে; কালগত ভেদে বৃন্দাবন থেকে পালিয়ে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেও 'অবতার নাহি কহে—আমি অবতার'—সাধারণভাবে চোর কখনও আমি চোর বলে না; অথচলোকে বলে—এই কলিরাজের প্রবলপ্রতাপকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রেমভক্তি বলে, ব্রজের নিগূঢ় প্রেমের ভাণ্ডার এই গৌরসুন্দর যার-তার জন্য উজাড় করে দিতে এসেছেন—তাই তিনি বড় অবতার।

* * *

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—ব্রহ্মাণ্ডে অনাদিকাল হতে ভগবদিচ্ছায় এমনভাবেই যুগ পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এরই মধ্যে জীব ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যুগোচিত ধর্ম পালন করছে। সত্য যুগের ধর্ম ধ্যান করা, ত্রেতা যুগের ধর্ম যজ্ঞ করা, দ্বাপর যুগের ধর্ম অর্চনা করা এবং

কলিযুগের ধর্ম নাম করা। আর এই যুগোচিত ধর্ম সম্বন্ধে সর্বোত্তম সাধন যেটি—পরম করুণায় সেই হরিনাম করার বিধান দিয়েছেন মহাপ্রভু। পূর্বে দ্বাপর যুগে কৃষ্ণার্চ্চন করার মন্ত্রটি ভাগবত থেকে উল্লেখ করেছেন—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সংকর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ।

—হে ভগবান্ শ্রীবাসুদেব! তোমাকে নমস্কার। হে সংকর্ষণ! তোমাকে নমস্কার। হে প্রদ্যুম্ন! তোমাকে নমস্কার। হে অনিরুদ্ধ! তোমাকে নমস্কার।

শ্রীকৃষ্ণ যে চাররূপে চতুর্ব্যূহে আত্মপ্রকট করে দ্বারকা—মথুরাতে লীলা করে থাকেন—অর্চনা করতে হলে সেই চারমূর্তিকেই অর্চনা দ্বারা পরিতুষ্ট করতে হবে। অথচ কলিযুগের জীব-উদ্ধারে অতি সহজ পথটি নির্দেশ করছেন মহাপ্রভু; যেন বোঝাতে চাইছেন—পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ-বিলাস মূর্তিতে অর্চনা করা কলিকালে সম্ভব নয়। তাই একমাত্র ভেষজ হলো—হরিনাম সংকীর্তন।

কারণ দ্বাপরের অর্চনা কলিজীবের হবে না; কারণ সে অর্চনা করতে হলে 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' হতে হবে; দেবতা আগে নিজে হতে হবে, তারপর দেবতার পূজা করতে হবে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণে গুণান্বিত হতে হবে।

সৃষ্টির মধ্যে এমন গুণবৈচিত্র্যে দেখা যায়, সত্ত্বগুণে দেবতা, সত্ত্ব আর রজোগুণে মানুষ, আর রজঃ ও তমোগুণে অসুর আর শুদ্ধ তমোগুণে পশু। তাহলে মানুষ যদি দেবতা হতে চায় তাহলে মানুষের মধ্যে রজোগুণকে সরিয়ে সত্ত্বগুণের আধিক্য ঘটাতে হবে। সত্ত্বগুণের আধিক্য ঘটানোর জন্য যে সব ক্রিয়া রয়েছে, যে সব অনুষ্ঠান রয়েছে—কলিকালের মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কলিকালের মানুষ রজঃ আর তমোগুণে ভরা; সত্ত্বগুণের ছিটে-ফোঁটাও তার মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। তাহলে সত্ত্বগুণে বিভূষিত হয়ে দেবতার পদে নিজেকে উন্নীত করে দেবতার পূজার্চনা করা কলিযুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ সমগোষ্ঠীতে না এলে কি অর্চনা সম্ভব? 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' হওয়ার কোন উপায় অল্পায়ু, অস্থির মতি, রজস্তমোগুণান্বিত কলিজীবের নেই বলেই মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলছেন,—'কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন—কলিযুগের ধর্ম্ম।'

মহাপ্রভুর কথা শুনে সনাতন প্রভুর মুখপানে চাইলেন। প্রভু নিজের কথা নিজে বলছেন ভক্তাধীন চাতুরী অবলম্বনে—

'পীতবর্ণ ধরি' তবে কৈল প্রবর্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ॥
ধর্ম প্রবর্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায়, নাচে লোক, করে সংকীর্তন॥
(চৈ. চ—২/২০/৩৩৮—৩৯)

অবতারের বর্ণ কেমন?—বলছেন পীতবর্ণ। সেই অবতার এই কলিজীবকে অকাতরে কোন সুদুর্লভ বস্তুটি বিতরণ করছেন?—বলছেন প্রেমভক্তি। আরও বলছেন, —প্রিয় পার্ষদবর্গকে সঙ্গে নিয়েই সেই পীতবর্ণধারী অবতার যাকে-তাকে প্রেমভক্তি প্রদান করছেন, পাত্রাপাত্র কোন ভেদ নেই। এমন অবতার, যাঁকে সনাতন নিজ চর্মচক্ষের দ্বারা দর্শন করছেন, যাঁর অমৃত-উপদেশ নিজ কর্ণে শ্রবণ করে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়কে সার্থক করছেন—সেই অবতার অন্য কেউ নয়...সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। সনাতন শুনছেন, ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন ধর্ম প্রবর্তন করতে পীতবর্ণধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়েছেন। তাঁরই অপার করুণায়, তাঁরই দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণাদি আবেশ জনিত 'প্রেমে গায়, নাচে লোক, করে সংকীর্তন।' তবু প্রভুর এমন সহজ-সরল কথা শুনেও অবতার-লক্ষণ জিজ্ঞাসা করছেন,—

রাজ মন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসংকোচমতি॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি, নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন অবতার? (চৈ, চ—২/২০/৩৪৮—৪৯)

প্রভু বলছেন, অন্য অবতারের কথা শাস্ত্র-দ্বারে জানা যায়, যেমন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ভগবান শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন; কিন্তু কলিকালে—

প্রভু কহে,—'অন্যাবতার শাস্ত্র-দ্বারে জানি।
কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্র-বাক্যে মানি॥
সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ।
আমা সভা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান॥
অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার'।
মুনি-সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥

এমন ভাবেই একসময় গোপীনাথ আচার্য দ্বারা মহাপ্রভুর

কিঞ্চিত মহিমা-দর্শন হেতু গোপীনাথসহ সার্বভৌম শিষ্য-গণের তর্ক-বিতর্ক ও বিচারকালে—

শিষ্যগণ কহে, ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে ?
আচার্য্য কহে—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ॥

প্রভু যে কথা স্বয়ংই সনাতনকে বলছেন—'মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার, ; প্রভুর কৃপায় গোপীনাথ সে কথাই বলেছেন সার্বভৌমকে—'বিজ্ঞমত ঈশ্বর লক্ষণে।' সর্বজ্ঞ মুনিগণ ঈশ্বর-অবতারাদি সহ ঈশ্বর-লক্ষণ সম্বন্ধে যা বলে গেছেন, তাই শাস্ত্র হয়ে, আছে—তেমন শাস্ত্র-প্রমাণই ঈশ্বরকে চেনা জানার উপায়।

মুনিগণের লক্ষণ বিচারটি কেমন, শ্রীল সনাতনকে সে কথা জানাতেই প্রভু বলছেন, 'শুন সনাতন ! ঈশ্বরের দুটি লক্ষণ রয়েছে—একটি স্বরূপ লক্ষণ অপরটি তটস্থ লক্ষণ। আকৃতি-প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ। কার্য দ্বারায় জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ।'

অনুভবে সনাতন বুঝলেন,—স্বরূপ লক্ষণ অর্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর তটস্থ লক্ষণ অর্থে পরোক্ষ প্রমাণ। শ্রীভগবানের ভুবনমোহন সর্বচিত্তাকর্ষক অপরূপ রূপ দেখে যদি তাঁকে অপ্রাকৃত বস্তু বলে মনে হয় তবেই তেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণকে ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করে ; অন্যদিকে শাস্ত্র যুক্তি সবই পরোক্ষ প্রমাণ। শ্রীভগবানের রূপ দেখে মোহিতস্বরূপ লক্ষণে আকৃষ্ট হয়ে তবেই তটস্থ লক্ষণে জীব হয়। সে কারণেই মহাপ্রভু যখন বলছেন,—'এই দুই লক্ষণে অবতার কালে যখন কেউ জগতে গোচর হয়, তখনই তাকে ঈশ্বর বলে তুমি জানবে।'

সনাতন সব কিছু বুঝতে পেরে এবার চাতুরালী করছেন,—

'সনাতন কহে,—যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সংকীর্তন।
কলিকালে সে-ই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥

পীতবর্ণ-বিশিষ্ট ভুবন ভোলানো মহাপ্রভুর অনন্ত রূপমাধুরী আকণ্ঠ পান করেছেন শ্রীপাদ সার্বভৌম—সর্বাবতারী ভগবান্ রূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি দর্শনেই লাভ করেছেন তবে 'মুনি সব জানি করে' যে-সব 'লক্ষণ বিচার'—সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য' রূপে সেই সব 'শাস্ত্র-পরমাণ' ভূরি ভূরি দেওয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দর যে পূর্ণতম সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—শাস্ত্র প্রমাণ বর্ণন মানসে গোপীনাথ আচার্য নিজে ভগিনীপতি হয়ে শ্যালক শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলছেন,—

'ভাগবত, ভারত—দুই শাস্ত্রের প্রধান। এই দুই গ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান?' সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন—তারই এক-একটি শাস্ত্র-প্রমাণ দিয়ে চলেছেন আচার্য গোপীনাথ ; শুনছেন পণ্ডিত সার্বভৌম ; যেমন ভাবে সনাতনকে ভক্তিশিক্ষা দিতে মহাপ্রভু বলছেন,—'যে অবতার, সে কখনও নিজে বলে না আমি অবতার—মুনি মুখ নিঃসৃত শাস্ত্র বাক্য হতে বুঝে নিতে হয়—তিনি অবতার, —'আমা সভা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান।' অথচ ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের কয়েকজন মহাপুরুষ নিজেরাই নিজেদের 'অবতার' বলে প্রচার করতে দ্বিধা করেননি—বস্তুত, তাঁদের কেহই অবতার কিংবা তাঁদের কলা বা অংশবিশেষও হতে পারেন না।

* * *

কোন্ যুগে শ্রীভগবানের কোন্ অবতার—তাঁর কোন্ বর্ণ, কি নাম এবং তাঁর অর্চনা বিধিই বা কেমন, ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ বর্ণনা প্রসঙ্গে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর শেষে কলিযুগাবতার সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত (১২/৫/৩২) বলছেন,—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

নিমিরাজাকে করভাজন বলছেন,—হে রাজন্। কলি-কালে ভগবানরূপে তিনিই অবতীর্ণ হবেন, যিনি সর্বদাই মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলছেন এবং যাঁর দেহের বর্ণ পীত,সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁর অঙ্গ (নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি), উপাঙ্গ (শ্রীশ্রীবাসাদি), অস্ত্র (শ্রীহরিনাম) ও পার্ষদ (শ্রীগদাধরাদির) সঙ্গে সংকীর্তন-প্রধান যজ্ঞ দ্বারা সেই অকৃষ্ণকে (গৌর-কান্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে) অর্চনা করে থাকেন।

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' বচনে বোঝা যায়, কলিযুগের অবতার কৃষ্ণবর্ণ, তবে কান্তিতে গৌর হয়েছেন। অর্থাৎ কলিযুগে শ্রীভগবানের যে অবতার, তিনি অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ

হলেও কান্তিতে অকৃষ্ণ—অর্থাৎ গৌরবর্ণ বিশিষ্ট।

তবে কলিযুগের কৃষ্ণবর্ণ অবতার, প্রসঙ্গে চারযুগের অবতারাদি কথনে শাস্ত্র বলছেন,—

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥
(লঘু-ভাগবতামৃত—যুগাবতার প্রকরণ)

অর্থাৎ বর্ণানুযায়ী শ্রীভগবানের যে যে অবতার রয়েছেন, তাঁদের আবির্ভাব এই প্রকার, যথা—শুক্লবর্ণ সত্যযুগে, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, শ্যামবর্ণ দ্বাপরে এবং কলিযুগে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে থাকেন।

তাহলে, 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' বচনের সঙ্গে উক্ত লঘু-ভাগবতামৃত বচনের সঙ্গতি রক্ষার্থে শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ব্যাখ্যাতা শ্রীল রাধাবিনোদ গোস্বামী বলছেন,—"লঘু ভাগবতামৃতের বচনে যে বর্ণভেদের উল্লেখ—উহা সাধারণ যুগাবতারের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু যুগবিশেষে যে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারেনা তাহা নহে। প্রতিযুগেই সেই মন্বন্তরাবতার যুগাবতাররূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম প্রবর্তন করেন। কিন্তু যে-দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই যুগে সেই শ্যামবর্ণ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন। তদ্রূপ যে কলিযুগে স্বর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন, তৎকালে সেই যুগের কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। শাস্ত্রধর্ম হইতে ইহাও জানা যায় যে, বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এবং সেই দ্বাপরের পরবর্তী কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন। লঘু ভাগবতামৃতের বচনে সাধারণ কলিযুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া নির্ণীত হইলেও তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণ, তিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ বা গৌর নহেন। তিনি অপর কাহারও কান্তি গ্রহণ করিয়া অকৃষ্ণ বা পীতবর্ণ ধারণ করেন না। কিন্তু যে বিশেষ কলিযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের কান্তি অকৃষ্ণ বা পীতশোভা ধারণ করিয়াছে। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি স্বরূপা এবং তাঁহারই ভাবকান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব তৎকালে কৃষ্ণবর্ণ স্বভাব সাধারণ যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন বুঝিতে হইবে"।

কলিযুগের উপাস্য 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' যে গৌরবর্ণে আচ্ছন্ন হয়ে অবতীর্ণ হবেন, সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় প্রমাণরূপে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের উক্তিকে অবলম্বন করা যেতে পারে।

ইত্থং নৃতির্যগৃষি দেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্বম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৯/৩৮)

তবে যে শ্রীভগবানকে 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত করা হয়, তারই কারণরূপে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ—হে মহাপুরুষ! আপনি এই প্রকারে মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য, ইত্যাদি অবতার লোকসকলের পালন এবং যে সমস্ত লোক জগতের প্রতিকূল, তাদের বিনাশ আর যুগে যুগে যে ধর্ম অনুবৃত্ত তাকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। এইসব কার্য-সম্পাদনে আপনি কলিযুগ ব্যতীত অপর যে তিনটি যুগ রয়েছে, সেই সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে আপনি স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হন, ফলে আপনাকে লোকে 'ত্রিযুগ' বলেই জানে কিন্তু কলিযুগে সেই ত্রিযুগ-নামী আপনি (গৌরবর্ণে) আচ্ছন্ন স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' বচনের 'অকৃষ্ণ' অর্থে 'ছন্নকলৌ' প্রমাণ ধৃত হওয়ার পর শ্রীমদ্ভাবতেই সুন্দর সিদ্ধান্ত রয়েছে শ্রীমদ্‌গর্গাচার্য্যমুনির 'ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' বচনে। সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে গোপরাজ শ্রীনন্দের প্রতি পরমহংস-শিরোমণি শ্রীগর্গাচার্য্যমুনি বলেছেন,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৮/১৩)

ওহে ভদ্র! তোমার এই পুত্রটি প্রতিযুগেই শরীর পরিগ্রহ করেন, এই পুত্রের ইতিপূর্বে শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনবর্ণ হয়েছিল, ইদানীং কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন—অতএব এই পুত্রের একটি নাম "শ্রীকৃষ্ণ।"

"ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" বচনের সঙ্গে 'শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ' বচনকে যুক্ত করে অন্বয়ার্থে শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু যে অর্থ প্রকাশ করেছেন—তা অতীতকাল এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ যে অর্থ প্রকাশ করেছেন—তা ব্যাপৃত বর্তমান কালের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে।

'এই পুত্রের ইতিপূর্বে শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনবর্ণ হয়েছিল, ইদানীং ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন'—এই প্রকার ভাবার্থে গৌর সুন্দরের পীতত্ববর্ণের অতীতকালের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভব, সে সম্বন্ধে বলা যায়—

যদ্ দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তস্মিন্নেব কলৌ গৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। (ক্রমসন্দর্ভ টীকা)

—'ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ'—সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ এরপর, পীতবর্ণ, তারপর রক্ত এবং সর্বশেষে শুক্ল, এইভাবে বিবর্ত্তাবর্তনে কল্পভেদে পূর্বে পূর্বে যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎপূর্বে অবতীর্ণ হয়েছেন, তারই অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে পীতবর্ণ গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হয়েছেন।

অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবদোক্ত (১০।৮।১৩) শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'তথা পীতঃ' শব্দের প্রয়োগে 'যথা' শব্দের অর্থ স্বভাবতই প্রসঙ্গক্রমে প্রয়োজন পড়ে, তবে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবাচার্য্য 'তথা' শব্দটিকে শ্লোকে একপ্রকার উহ্যই রেখেছেন বুঝতে হবে। এবং চতুর্থ চরণে 'ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' বচনে ইদানীং কালটিও ব্যাপকতর অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তাহলে ব্যাপৃত বর্তমান কালের ক্ষেত্রে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ আলোচ্য ভাগবতীয় (১০।৮।১৩) শ্লোকের টীকায় বলছেন,—

যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাৎ ইদানীং দ্বাপরান্তে, কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়মবতারী। তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদি ভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি।" (সারার্থ দর্শিনী)

শ্রীনন্দ মহারাজকে আচার্য গর্গ যেন এইভাবে বলছেন, —ওহে ভদ্র! তোমার এই পুত্রটি প্রতি যুগেই শরীর পরিগ্রহ করেন। কখনও ইনি শুক্লবর্ণ, কখনও বা রক্তবর্ণ। সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন (ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ); তবে এখন যেমন ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তেমন এখনই অল্পকাল পরে ভবিষ্য কলির প্রারম্ভে ইনি পীতবর্ণ ধারণ করবেন।

সেই পীতবর্ণকেই অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরসুন্দর মহৎ-চাতুরী অবলম্বনে উৎকণ্ঠিত শ্রোতা শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলছেন,—পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্তন··· ধর্ম প্রবর্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

সর্বমাধুর্যসার রসরাজ-মহাভাব শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত—সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এমন কি বিদগ্ধ জনের মতে পঞ্চমবেদ রূপে স্বীকৃত।

সেই কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের ভাগবতীয় প্রমাণ ধৃত হওয়ার পর বলা বাহুল্য, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষদাদি বহু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু হলেন সর্বাবতারী—এটা মনে রাখা প্রয়োজন এবং তাঁরই অমৃতময় বাণী এই বিশ শতকের ক্ষণিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠায় লোভী গুটিকয়েক সাধু-সজ্জনের শিষ্যবৃত্তি পেশাকে ইঙ্গিত করে এখনও ধ্বনিত হয়—'অবতার নাহি কহে—আমি অবতার।'

"অন্যান্য ধর্ম্মে যেখানে শেষ, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সেইখানেই আরম্ভ।"

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ।

বাসনা পূর্ত্তি লীলা

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের স্বরূপে ব্রজলীলায় তিনটি বাসনা উদ্‌গমের হেতু দেখালেন—

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম ॥

শ্রীগোবিন্দের বাসনা উদ্‌গমের সূত্র হল দুটি—প্রথম রসিকশেখরতা আর দ্বিতীয় পরমকারুণ্য। কবিরাজ বলেছেন—এ চৈতন্যলীলা কে জানবে? 'পক্ষী যেমন আকাশের কিছুই না পায় টের যতদূর শক্তি উড়ি যায়।' শ্রীচৈতন্যলীলা আস্বাদনও সেই রকম। যতই আস্বাদন করা যাক কতটুকুই বা আস্বাদন করা যেতে পারে? চৈতন্য-লীলা অগাধ অপার কে তা গণনা করবে? আকাশকে কি সীমা করতে পারা যায়? যার যতটুকু শক্তি সে ততটুকু আস্বাদন করে অর্থাৎ যার ওপর যতটুকু কৃপা হয়েছে সে ততটুকু আস্বাদন করে। চৈতন্যলীলা আস্বাদনের শক্তি কৃপাই, অন্য কোন শক্তি নেই। শ্রুতি বললেন—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। যাকে তিনি কৃপায় বরণ করেন সে-ই তাঁকে জানতে পারে। ভগবানের কৃপালোকেই তাঁকে অনুভব করা যায়—জানা যায়—অন্য কিছু দিয়ে জানা যায় না। যেমন সূর্য্যের আলো দিয়েই সূর্য্য দেখা যায় অন্য আলোয় সূর্য্য দেখা যায় না। গোবিন্দ স্বরূপে তিনটি বাসনা জেগেছিল ব্রজলীলায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এ তিনটি বাসনা কি এবং সে বাসনার জন্মভূমি কোথায়? আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরু মহারাজ শ্রীল শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের আস্বাদনের বাক্য—

'রাসরসে খেলতে খেলতে
হইল ইচ্ছার উদ্গম।'

রাসরসে খেলতে খেলতে যখন ইচ্ছার উদ্গম তখন বুঝা যাচ্ছে রসিকশেখরতায় এই ইচ্ছা জেগেছে, কিন্তু এখানে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের আস্বাদনে পরমকারুণ্যে ইচ্ছার উদ্গম এটি তো স্পষ্ট করে বলা হল না। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ তো ইচ্ছার হেতুতে করুণার কথা বললেন না। তাহলে সমাধান হবে কি করে? রসিকশেখর যখন বলা হয়েছে তখনই তাঁর পরমকারুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। কারণ রসিকশেখরতাই করুণা হয়ে প্রকাশ পায়। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের বাণীটি বীজ আর শ্রীল কবিরাজের বাক্য প্রকাশমন্ত্র। এ এক বিচিত্র সংবাদ। ভগবানের রসিক শেখরতা অর্থাৎ লাম্পট্য এইটিই তাঁর পরম কারুণ্য। রূপে গুণে অতুলনীয় কোন রাজকুমার—তাঁর মহিষীবৃন্দই তাঁকে ভোগ করেন, রাজকুমার তো দাসীর ভোগ্য নন। কিন্তু রাজকুমারের রূপ-গুণ দাসীকেও প্রলুব্ধ করে, দাসীরও লোভ হয়, কারণ লোভ তো কোন হেতু মানে না, কিন্তু রাজ-কুমার যদি চরিত্রবান হন তাহলে দাসীর ভাগ্যে কোনদিনই সে লোভ চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু রাজকুমার যদি লম্পট হন তাহলে দাসী কোনদিন না কোনদিন আশা করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তেমনি রূপে গুণে অতুলন। শিব ব্রহ্মা যাঁর পাদপদ্ম ধ্যান করে। রাধা আদি ব্রজরমণীগণ যাঁর নিত্যকান্তা। এই নিত্যকান্তাই তাঁকে ভোগ করে। তাই জীব-দাসীর পক্ষে কৃষ্ণসম্ভোগ কোনদিনই সম্ভব হয় না কিন্তু কৃষ্ণ লম্পট বলেই জীব কৃষ্ণসম্ভোগের আশা করতে পারে। দাসীর যদি রূপ-যৌবন থাকে তবে রাজকুমার লম্পট হলে দাসী যেমন তাকে ভোগ করবার আশা করতে পারে, এখানে জীবও যদি ভজনের রূপ-যৌবনে ভাবপ্রেমে সজ্জিত হয়ে বসে থাকতে পারে তাহলে যদি কৃষ্ণ লম্পট না হতেন তাহলে এটি সম্ভব হত না। নিত্যকান্তা ছাড়া কেউ তাকে পেতে পারত না। কৃষ্ণের লাম্পট্যই কৃষ্ণের করুণা। রাসরসের খেলা লাম্পট্যেরই খেলা। কারণ স্বকীয়ার খেলায় গোবিন্দমাধুর্য্য সম্পূর্ণ আস্বাদন হয় না—যেমন দ্বারকার মহিষীরা কৃষ্ণসম্ভোগ করেছেন। কৃষ্ণমাধুর্য্য সাগর হলে কি হয় তাঁদের যতটুকু তৃষ্ণা সেই অনুপাতে তাঁরা সে মাধুর্য্য গ্রহণ করেছেন, আস্বাদন করেছেন। এ যেন মাপের ঘটিতে করে কুয়ার অফুরন্ত জল থেকে তোলা যেমন ঘটি তেমনি

জল উঠবে। স্বকীয়ার পাত্রে মেপে আবসাদন হয়—অফুরন্ত আস্বাদন হয় না। কিন্তু গোপীর কৃষ্ণতৃষ্ণার পাত্র পরকীয়ার পাত্র। লীলাশক্তি গোপরামাদের এই পাত্র দিয়েছেন। এ পাত্র অমাপা অফুরন্ত, তাই কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করে গোপীর তৃষ্ণা মেটে না। আরও চাই, আরও চাই অবস্থা। সকল গোপীর মধ্যে আবার রাধার পাত্র সবচেয়ে বড়। গোবিন্দমাধুর্য্য যত পরিমাণ তত পরিমাণ আস্বাদন করতে পারে একমাত্র রাধা। কৃষ্ণমাধুর্য্য যেমন বাড়ছে রাধারাণীর আস্বাদনের পাত্রও তেমনি বাড়ছে।

গোবিন্দ-মাধুর্য্য আস্বাদনের পাত্র হল রাধারাণীর অনুরাগ। রাধারাণীর প্রেম যত গুরু স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দও তত গুরু নন। কারণ গোবিন্দ বলেছেন—

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
নিত্য আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীগোবিন্দ ভগবত্তার চরম সীমায় দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে ঘিরে গোবিন্দমনোমোহিনী অসংখ্য গোপীর দল। তার মধ্যে রাধারাণী মুখ্যা। এই রাসরজনীতে রাধাগোবিন্দ উভয়ের উভয়ের প্রতি আকর্ষণ, উভয়ের আনন্দ উপভোগ এদের মধ্যে কার আনন্দ বেশী? রাধারাণীর তো কোন বিচার নেই কারণ রাধারাণী তো ভালবাসাঠাকুরাণী, প্রীতিঠাকুরাণী তিনি ভালবাসতে জানেন, ভালবাসা মাপতে জানেন না। কিন্তু রসরাজ গোবিন্দ বিচার করেছেন। রাধার কৃষ্ণ উপভোগ করার ফলে তাঁর শ্রীমুখে যে মাধুর্য্যরাশি ফুটে উঠেছে গোবিন্দ তা দর্শন করলেন, করে বুঝলেন তিনি রাধারাণীকে ভোগ করে যে আনন্দ পান রাধারাণীর কৃষ্ণসম্ভোগের আনন্দ যেন তার চেয়ে কিছু বেশী। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদও বলেছেন—

'স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ'—

'স্বভাবাৎ' অর্থাৎ গোবিন্দের যে রাধাপ্রেম অর্থাৎ ভক্তপ্রেম তার চেয়ে ভক্তের অর্থাৎ রাধার যে গোবিন্দের প্রতি প্রেম তা বেশী সুমধুর। এইটি বিভাব্য অর্থাৎ বিচার করে অর্থাৎ ভগবানের প্রেমের জাতি অপেক্ষা ভক্তের প্রেমের জাতি কুলীন। তখন গোবিন্দ মনে মনে ভাবলেন রাধার আনন্দ যদি পেতাম কিন্তু কেমন করে পাব? তত্ত্বশিরোমণি গোবিন্দের আজ বাসনা জেগেছে কেমন করে রাধার আনন্দ পাব? গোবিন্দ অনাদিরাদি এবং রসরাজ কাজেই তত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁর কোন অভাব নেই কিন্তু রসের ক্ষেত্রে তাঁর অভাব আছে। রসের দিক দিয়ে তিনি অপূর্ণ। কারণ রসে কেউ কখনও পূর্ণ হয় না। রসের স্বভাবই হল অভাবকে জাগিয়ে রাখা। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ স্বরূপে তাই পদকর্ত্তা লোচনদাসজী বললেন—

রসরত্নখনি তবু কাঙাল রসের।
অদ্ভুত চরিত আমার শ্রীনিতাই চাঁদের॥

নিত্যানন্দ মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ অক্ষর দিয়েছেন—

'রসখনির এই তো স্বভাব।
পূর্ণ হয়েও মানে অভাব॥'

রসের অভাব থাকাই হল রসের চমৎকারিতা। রসের অভাব থাকলে সে অভাবে দোষ হয় না। রসমাধুরী নিত্য ভোগ করাই তাঁর স্বভাব কিন্তু রসভোগের এমনই স্বভাব যে তাতে অভাব তো মেটেই না বরং উত্তরোত্তর সে অভাব বাড়ে। রসের স্বভাব নিরন্তর অভাবী করে রাখে।

শ্রীগোবিন্দ বিচার করলেন রাধার আনন্দমাধুরী আমাতে নেই। স্বরূপ দামোদরের কড়চাতে সে খবর ধরা পড়ল গোবিন্দ ভাবছেন, আমি তো রাধারাণীকে ভালবাসি কিন্তু রাধারাণী যে আমাকে ভালবাসেন সে ভালবাসা কেমন? এইটিই প্রথম বাসনা। আর আমার অদ্ভূত মাধুর্য্য রাধা সম্পূর্ণ ভোগ করে সেই আমার মাধুরীই বা কেমন? গোবিন্দের স্বরূপে মাধুরী আছে বটে কিন্তু সে মাধুর্য্য কেমন তার আস্বাদন কেমন পরিমাণ কতখানি তা গোবিন্দ নিজেই জানেন না। কারণ মিছরি নিজে কতখানি মিষ্টি তা মিছরি নিজে জানে না যারা ভোগ করে তারা জানে সে মিছরির মিষ্টির আস্বাদ। গোবিন্দ ভাবছেন আমার মাধুর্য্য ভোগ করে রাধার আনন্দের আধিক্য তাই আমার মাধুর্য্য আমি যদি নিজে ভোগ করতে পারতাম তাহলে রাধার মত আনন্দ পেতাম। আর রাধারাণী আমাকে ভালবেসে কি জাতীয় সুখ পান—এই তিনটি বাসনা কড়চায় ধরেছেন শ্রীস্বরূপদামোদরজী—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভূতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীগোবিন্দের মনের তিনটি বাসনা—(১) শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন (২) আমার মাধুরী কেমন বা সে প্রেমের মাধুরী কেমন ? (৩) আমার মাধুরী ভোগ করে রাধার কেমন সুখ হয় ? এখানে মধুররসের কান্ত গোবিন্দ এবং কান্তা শ্রীমতি রাধারাণী। কান্ত তার নিজের আনন্দ আস্বাদন জানেন আবার কান্তা তার নিজের আনন্দ আস্বাদন জানেন। কিন্তু দুজন দুজনকে জানতে পারেন না। অর্থাৎ কান্তা কান্তের আনন্দ এবং কান্ত কান্তার আনন্দ জানতে পারেন না। এখন কান্ত গোবিন্দের কান্তা রাধারাণীর আনন্দ জানবার বাসনা হয়েছে—এটি বিজাতীয় বাসনা। স্বরূপ দামোদরজী ব্রজের ললিতাসখী তাই গোবিন্দের মনের তিনটি বাসনা কড়চার মাধ্যমে ধরে দিয়েছেন। তা না হলে কে বা জানত ? গৌরহরি বলা হয় অর্থাৎ হরি আজ গৌর হয়েছেন। গোবিন্দের তিন বাসনার অনুবাদ করলেন শ্রীল কবিরাজ—

কৈছন রাধাপ্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তিঁহ ভোর।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—

'শ্রী রাধিকার প্রেম কেমন—
সে প্রেমের মাধুরী কেমন
সেই প্রেমে কিবা সুখ'—

প্রথম বাসনা সম্বন্ধে কোন অমিল নেই—শাস্ত্রবাক্য ও সাধুবাক্য (গুরুবাক্য) মিলে গেছে—শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন ? কিন্তু দ্বিতীয় বাসনাতে যেন একটু গরমিল মনে হচ্ছে। কড়চায় বলা হল—আমার মাধুরী কেমন ? মহাজন বাক্যে পাওয়া গেল কৈছন মধুরিমা। এখানে মধুরিমা বলতে কার মধুরিমা স্পষ্ট করে বলা হয় নি কিন্তু এটি পূর্ব্ব প্রসঙ্গ থেকে বুঝে নিতে হবে আগে যখন বলা হল কৈছন রাধাপ্রেমা এবং পরে বলা হল কৈছন মধুরিমা তখন এ মধুরিমা যে রাধাপ্রেমেরই মধুরিমা এইটিই বুঝাচ্ছে। কারণ 'রাম এসেছে' বলে যদি পরে বলা যায় 'খাবে' তাহলে কি বুঝায় ? বুঝায় রামই খাবে। তেমনি 'কৈছন রাধাপ্রেমা' তারপর বলা হল 'কৈছন মধুরিমা' তাহলে পূর্ব্বপ্রসঙ্গ নিয়ে রাধাপ্রেমেরই মধুরিমা বুঝাচ্ছে। শ্রীল বাবাজী মহারাজও মহাজনবাক্য সঙ্গতি রেখে বললেন

শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন
সে প্রেমের মাধুরী কেমন—

কড়চা হল শাস্ত্র, মহাজন বাক্য হল সাধুবাক্য আর গুরুবাক্য- তাহলে তো দেখা যাচ্ছে সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্যে মিল হল না। প্রথম বাসনা সম্বন্ধে কোন গরমিল নেই। দ্বিতীয় বাসনাতে গরমিল। শ্রীল বাবাজী মহারাজের বাক্যে আরও স্পষ্ট—সে প্রেমের মাধুরী কেমন ? তৃতীয় বাসনা সম্বন্ধেও তাই সে প্রেমে কিবা সুখ, কড়চায় আছে কিন্তু রাধারাণীর কি সুখ—এখানেও গরমিল-তাহলে মিল করতে হলে বিচার কি হবে ? কড়চার ছবি হল—(১) রাধার প্রেম কেমন ? (২) আমার মাধুরী কেমন ? (৩) আমার মাধুরী ভোগে রাধার কেমন সুখ ? গোবিন্দের এই তিনটি বাসনার ছবি কড়চায় ফুটেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গোবিন্দের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলীভূত কেন্দ্র কি ? প্রেমই সকল আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। রাধাপ্রেম বলতে রাধাতে আছে যে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম তাকেই বুঝাচ্ছে। এইটিই রাধার কৃষ্ণ-ভালবাসা—রাধারাণী গোবিন্দকে কি জাতীয় প্রেম করেন এটি কৃষ্ণের ছুঁতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ মন দিয়ে অনুভব করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কৃষ্ণের পক্ষে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। আশ্রয় বিষয় জাতির বাধাপ্রেমের বিষয়জাতি গোবিন্দ আর আশ্রয় জাতি রাধারাণী। প্রেম যেখানে তৈরী হয় সে হল আশ্রয়-জাতি আর তৈরী হয়ে যেখানে যায়, যে ভোগ করে সে হল বিষয়জাতি। এই বিষয় আশ্রয় দুই মিলে রসের পরিপূর্ত্তি। যেমন দুটি ডানার ওপর ভর করে পাখী আকাশে ওড়ে। একটিকে কেটে বাদ দিলে পাখী যেমন উড়তে পারে না তেমনি আশ্রয় ও বিষয় দুটি নিয়ে রসের পুষ্টি। কৃষ্ণ আস্বাদন করার যে ক্ষুধা তারই নাম কৃষ্ণপ্রেম। ক্ষুধা অনুযায়ী আস্বাদনের তারতম্য হয়। রাধাতে এই কৃষ্ণপ্রেম সীমা লাভ করেছে। কৃষ্ণপ্রেমই গাঢ় হতে হতে মাদনাখ্য মহাভাবে গিয়ে পৌছেছেন—তারই মূর্ত্তি রাধারাণী। এর থেকে বড় ক্ষুধা আর নেই। প্রেম ছাড়া কৃষ্ণ আস্বাদন হয় না। তাই এই প্রেমই গোবিন্দের সকল বাসনায় মূলী-ভূত কেন্দ্র। প্রেম উপকরণেই গোবিন্দ মাধুর্য্য ভোগ হবে। তাহলে গোবিন্দ মাধুরী কেমন যেটি দ্বিতীয় বাসনা সেটিও প্রেম বিষয়ক। গোবিন্দে মাধুরী আছে কিন্তু গোবিন্দে তো গোবিন্দ প্রেম নেই তাই গোবিন্দের স্বরূপে মাধুরী থাকা সত্ত্বেও সে মাধুরী উপভোগ করতে পারেন না যেমন ক্ষুধার অভাবে খাদ্যের আস্বাদন হয় না। তাই প্রশ্ন জেগেছে আমার মাধুরী কেমন ? আবার তৃতীয় বাসনা রাধার

কৃষ্ণভোগ করে যে সুখ সেটিও প্রেমেরই সুখ কারণ প্রেমই তো কৃষ্ণভোগ করায় মহাজন বললেন—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দা।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সহজ কথায় বললেন —সে প্রেমের মাধুরী কেমন? সেই প্রেমে কিবা সুখ? সুতরাং সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্যে কোন গরমিল হল না।

এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে তিনটি বাসনা সবই বিজাতীয়—কারণ বিষয়জাতি জানতে চাইছেন আশ্রয়জাতির আস্বাদন। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীগোবিন্দের পক্ষে এটি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না—কারণ সন্তান (বিষয়জাতি) যেমন পিতামাতার (আশ্রয়জাতির) ভাব জানতে পারে না—এও সেইরকম। গোবিন্দ তত্ত্বে পূর্ণ পূর্ণতম কিন্তু রসে অপূর্ণ। এই রসের আস্বাদনে তাঁর লোভ জেগেছে। লোভে মানুষ অকার্য্য করে। রাধার প্রেম, প্রেমের মাধুরী রাধার কৃষ্ণসম্ভোগের সুখাস্বাদন কেমন করে হবে, কেমন করে পাব, গোবিন্দের এই লোভ—কিন্তু ব্রজে গোবিন্দ স্বরূপে থেকে এ লোভ পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই। যেমন পুত্র পিতামাতার অন্তরের দরদ জানতে চাইলে তাকে পিতামাতা হতে হবে তবেই সম্ভব। এখানেও তাই— কৃষ্ণ যদি রাধারাণী হতে পারেন তবে কৃষ্ণের পক্ষে রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন সম্ভব। তাই শ্রীল কবিরাজ বললেন—

তখন ভাবিয়া দেখিলা মনে শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।
তাই রাধাভাবকান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করল উদয়।

গোবিন্দকে রাধারাণী হতে হবে—অর্থাৎ রসরাজকে মহাভাব হতে হবে—বিষয়জাতিকে আশ্রয়জাতীয়ভাবে বিভাবিত হতে হবে। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ অষ্টকে বললেন—শ্রীগোবিন্দ রাধারাণীর অপার রসভাণ্ডার লুণ্ঠ করে এবং রাধারাণীর গৌর বরণ দিয়ে নিজের কালো বরণ ঢেকেছেন—রাধারাণীর ভাব ও কান্তি নিয়ে গোবিন্দ গৌর হয়েছেন। রাধারাণীর স্বরূপে দুটি বস্তু আছে—ভাব ও কান্তি। ভাব মানে প্রেম এবং কান্তি মানে বরণ। এই দুটি নিতে পারলেই রাধারাণী হওয়া হল। গোবিন্দ চুরি করেছেন কারণ চাইলে এতটা পেতেন না যাতে নিজে আস্বাদন করবেন আবার আচণ্ডালে সেই প্রেম সম্পদ বিতরণ করবেন— এ সঙ্কল্পও তো আছে। আবার রাধারাণীর প্রেমকে গুরু করেও রসরাজ মহাভাব হয়েছেন—সে প্রসঙ্গ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে আছে। শ্রীশ্যামসুন্দর বলেছেন—

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
নিত্য আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥

গোবিন্দ আজ রাধারাণীর প্রেমভাণ্ডার হৃদয় ভরে নিয়ে এলেন। গোবিন্দের হৃদয়ে আজ রাধাপ্রেম পৌঁছুল। গোবিন্দহৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে আজ রাধার হৃদয় হয়ে গেল। রাধার প্রেমহিঙ্গুলে আজ গোবিন্দের ভিতর বাহির রাঙা হয়ে গেল। এই অনুরাগের মূর্ত্তি বলেই শ্রীহোলীতিথিতে গৌর আবির্ভাব। গোবিন্দ আজ রাধাভাবকান্তিতে বিভাবিত হলেন। তাই নিকুঞ্জমন্দির থেকে কৃষ্ণ যখন বেরুলেন তখন কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নন, তিনি রাধা। তাই রাধা যেমন কৃষ্ণ বলে কাঁদেন তেমনি রাধাবিভাবিত কৃষ্ণ আজ 'কৃষ্ণ' বলে কাঁদছেন। রাধার অঙ্গ কান্তিতে কালো অঙ্গ ঢেকেছেন—তাই তখন তাঁকে আর কৃষ্ণ বলে চেনা যাচ্ছে না—কেউ আর তাকে ধরতে পারে না—ধরা পড়েছেন অনেক দূরে গিয়ে গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের কাছে।

গোবিন্দের অন্তর বাহির আজ রাধাময় হয়ে গেছে। এই অন্তর বাহির রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগোবিন্দই ভক্তজনের প্রাণধন শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়ার প্রাণগোরা। রসিকশেখরতায় যেমন তিনবাঞ্ছা—পরমকারুণ্যেও তিনবাঞ্ছার উদয় হয়েছে।

পরমকরুণ বলতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করুণ। অপরের দুঃখমোচনের জন্য চিত্তের ব্যাকুলতার নামই করুণা। অন্য সকলের মধ্যে এ করুণা যথাসম্ভব কিন্তু গোবিন্দে এ করুণা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাই পরমকরুণ। অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান, পুত্র, বিত্ত, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা আরোগ্য, আয়ু সবই জাগতিক কল্যাণ—এ কল্যাণ কল্যাণ নয় তাতে দুঃখের মাত্রাই বাড়ে কারণ কোনটিই চিরস্থায়ী নয় এমনকি স্বর্গসুখও ক্ষয়ী। আত্মজ্ঞানই প্রকৃত কল্যাণ। মায়ামুক্তিই কল্যাণের প্রথম ভূমি। এই ভূমিই ক্রমশঃ বাড়ছে। ভাগবতী ভূমিই জীবের চরম পরম কল্যাণ—এর ওপরে আর কল্যাণ নেই। গরগর অনুরাগে ভগবৎ পাদপদ্ম যে ভজায় সেই

পরম করুণা—এই হল মহাভক্তির পথ। এ ভক্তি বিধি-বিধানে মেলে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত ভক্তি হলেন 'রম্যা কাচিদুপাসনা'—যে ভক্তির পথ প্রেমবর্ত্তিকার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে —এখানে স্তরে স্তরে আনন্দ, সাধনকালেও আনন্দ। এ পথে চলতে আরম্ভ করলেই সাধুমহাজনের সাহচর্য্য পাওয়া যায় কাজেই একা যেতে হবে না। তাই মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভক্তিপথকে শুদ্ধ ভক্তিপথ না বলে মহাভক্তির পথ বলা হয়েছে। দানের বস্তু দেখে করুণা বিচার করতে হবে। বিচার করে দেখা গেছে গৌর ভগবান কলিজীবকে যে বস্তু দান করেছেন এদান কোনকালে কেউ পায় নি এবং বস্তু হিসাবেও সর্ব্বোত্তম তাই গৌরকরুণাও সর্ব্বোত্তম। অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপে এ করুণা হয় নি। কৃষ্ণ স্বভাবে কৃপণ তাই এই প্রেমভক্তি দান তাঁর স্বরূপে সম্ভব হয় নি। কৃপণ যদি কখনও মাতাল হয়ে যায় তাহলে হাত খুলে দান করতে পারে। কৃষ্ণচন্দ্র আজ রাধারাণীর প্রেমমদিরা পান করে মাতাল হয়েছেন তাই গৌরস্বরূপে এদান সম্ভব হয়েছে। পাওনার চেয়ে কম দিলে সে কৃপণ আর পাওনার চেয়ে বেশী যে দেয় সেই তো দাতা। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বললেন গৌর যে দাতা হয়েছেন তা হল 'স্বকার্পণ্যদোষদূরীকরণায়'—গোবিন্দ স্বরূপের কৃপণতা দোষ দূর করবার জন্য।

মহাতীর্থ শ্রী মন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ভূমি গৌরপ্রিয়-পরিকর শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গসুন্দরের শুভ পঞ্চশতবার্ষিকী জন্মোৎসব জয়যুক্ত হোন। গৌররসে ডগমগ নিতাই গৌর বুকে ধরা আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজ শ্রীল শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থলী পুণ্যভূমি শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম শ্রী গৌরসুন্দর এখানে নিত্যবিরাজিত। চরম পরম আস্বাদ্য রসময় গৌরকিশোর আজ নিত্য আস্বাদক শ্রীল বাবাজী মহারাজের আস্বাদনে বাঁধা পড়ে আছেন।

সাধুবৈষ্ণব শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি—এবারে যেন শ্রীপাদের প্রাণের প্রাণ 'নিতাই গৌর' 'রাম রাধারমণ' বলে মরতে পারি।

"এক উপায়ে জাতি-ভেদ উঠে যেতে পারে—যে উপায়—ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হ'লেই দেহ, মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। গৌর নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, ভক্তি থাকলে চণ্ডাল, চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি, ভক্তি থাকলে—শুদ্ধ পবিত্র হয়।"

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত—৫ম ভাগ ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে ভজনস্তর

শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরী

ভবভয়ভজন-কারণ পরমকরুণ কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু কলির জীবের কলুষকালিমামলিনচিত্ত দেখে, করুণায় বিগলিত হৃদয় হয়ে, জীবগণকে সহজসাধ্য সাধনপদ্ধতি উপদেশ করেছেন। নীলাচলে গম্ভীরায় প্রভু আমার, শ্রীল স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল রামানন্দ রায়ের সংগে শ্রীকৃষ্ণলীলারসাস্বাদনে বিহ্বল হয়েছিলেন। গম্ভীরার সেই অপ্রশস্ত কক্ষে প্রভু সব ঐশ্বর্য্য গোপন ক'রে লীলা করছেন। তখন তিনি একদিন তাঁদের লক্ষ্য করে আটটী শ্লোক পাঠ করেন ব'লে কথিত আছে। এই আটটী শ্লোক সকল বৈষ্ণবের কণ্ঠহার, সকল ভক্তের হৃদয়ের ধন, নিত্য আস্বাদ্য পরমাদৃত শ্রীশিক্ষাষ্টক। এই আটটী শ্লোকের ভিতর দিয়ে তিনি নামের মাধ্যমে সাধনার ক্রম ও পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন, যাতে জীবের ঈশ্বর সাধনার পথ সুগম হয় এবং যাতে জীব কৃষ্ণ প্রেম লাভ ক'রে মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করতে পারে।

জীব শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটলীলা দর্শন করেও, গ্রহণ করতে পারেনি। তাই তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হ'য়ে, কিভাবে সাধনা করতে হয়, তাই দেখাতে আবির্ভূত হয়েছেন কেননা

"আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে"

চৈ. চ. আদি—৩।২৬

ভক্তজনকে সাধনার ধারা শিক্ষা দিতে স্বয়ং ভগবান ভক্তরূপে আচরণ করেছেন।

"আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।"

চৈ. চ. আদি—৩।২১

সাধনার সেই ক্রমটী শিক্ষাষ্টকের মধ্য দিয়ে আস্বাদনের পূর্ব্বে আমাদের জানা দরকার, ঐশ্লোক উচ্চারণের পূর্ব্বে তাঁর অবস্থা ও ভাব কিরূপে ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে আছে—

"এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনীদিবস কৃষ্ণ বিরহবিহ্বলে॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন সনে।
রাত্রিদিনে রসগীত শ্লোক আস্বাদনে॥

চৈ. চ. অন্ত্য—২।৩-৪

এইরূপ অবস্থায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হয়ে, কৃষ্ণবিরহবিহ্বল অবস্থায় একদিন মনে করছেন, যখন আমি কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হয়েছি তখন

দরিদ্র মোর জীবন, দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব
"কাঁহা মোর প্রাণ নাথ মুরলীবদন
কাঁহা করোঁ, কাঁহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুখ
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।

চৈ. চ. মধ্য—২।১৫-১৬

কৃষ্ণবিরহ ব্যাকুলা শ্রীমতীর ভাবে আবিষ্ট প্রভু আমার, স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠ ধরে নিজ সখী মনে করে, মর্ম্মস্পর্শী বেদনার সংগে বলছেন—"সখি, নন্দকুলচন্দ্রমা আমার সে প্রাণগোবন্দকে একবার আমায় দেখা। তাঁকে না দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় যে।"

শ্রীকৃষ্ণবিরহস্ফুরণে তাঁর মনে এমন ব্যাকুলতা জেগেছে, যে তাঁর মনে হচ্ছে যে কোনদিনই তাঁর গোবিন্দসেবার সৌভাগ্য হয়নি। কিভাবে সে সেবা পেতে পারেন, সেই উপায় সম্বন্ধে তখন তাঁর অনুসন্ধিৎসা হোলো কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের আবার কিছু জানার জন্য অনুসন্ধান তো করতে হয়না। তবে তিনি এখন নরলীলা পরায়ণ তো, তাই লীলার অনুরোধে তাঁর সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রচ্ছন্ন থাকলেও তাঁর এই শক্তিগুলি তাঁর পিছনে দাসীর মত আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাই যেই মহাপ্রভু কৃষ্ণ সেবার উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন, অমনি তাঁর চিত্তে সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি নাম-সংকীর্ত্তনের কথা ও মাহাত্ম্যের স্ফুরণ করে দিল। সে উপায়—কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন। অমনি তিনি শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করলেন—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনমং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥(১)

চৈ. চ. অন্ত্য—২০।২১

সর্ব্বমংগলময় কৃষ্ণনাম সাধনপথের সব বিঘ্ন, অন্তরায় পরাস্ত করে নিজে বিজয়ী হন। এই কৃষ্ণনাম কিরূপ? চিত্তরূপদর্পণের মার্জ্জনাস্বরূপ—অনাদিকালের কামনা বাসনার কালিমায় মলিন চিত্ত যেন মলিন দর্পণ। চিত্তদর্পণকে পরিষ্কার করতে হলে চাই নামেরর মাজন। দর্পণ নাহয় পরিষ্কার হোলো কিন্তু আমাদের যে দিবারাত্রি "সংসারদাবানলে হিয়া জ্বলে, কি করিব কি হবে উপায়—" এ দাবানল নামের অমৃধারা বর্ষণে নিভতে পারে। তারপর অগ্নি নির্ব্বাপিত করে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কল্যাণরূপ কুমুদফুলের স্নিগ্ধ শীতল দীপ্তি চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। কৃষ্ণ ভক্তিরূপ বিদ্যাবধূর জীবন এবং এই নাম প্রতিপদে আনন্দের সমুদ্রে উচ্ছলিত এবং অমৃতের মত পদে পদে স্বাদু। সকল আত্মাকে শুদ্ধ পবিত্র করে দেয় স্থাবর জঙ্গম কাউকে বাদ দেয় না।

শ্রীকৃষ্ণ নামের এমন যে মাধুর্য্য, এত যে শক্তি, তথাপি জীবের নামে রুচি হয় না। তাই মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক উচ্চারণ করলেন।

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ (২)

চৈ. চ. অন্ত্য—২০।১৬

নামসংকীর্ত্তনের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে ভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে হোলো—এমন নামে তাঁর অনুরাগ নেই, তাই তিনি নামের ফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই কথা স্মরণেই প্রভুর মনে দৈন্য ও বিষণ্নতা এসে গেলো, তখন তিনি দ্বিতীয় শ্লোক উচ্চারণ করে বললেন,—শ্রীভগবান তাঁর বহুপ্রকার নাম প্রচার করেছেন এবং সেই সেই নামে তাঁর সর্ব্বশক্তি অর্পণ করেছেন। নামপূরণ বিষয়ে কোনো কালাকাল নির্দ্দিষ্ট করে দেননি। এত তাঁর কৃপা, তবু আমার মানব জন্ম পেয়েও কৃষ্ণনামে রুচি হোল না।

নামে রুচি কেন হয় না? আমরা নাম করতে জানিনা তাই প্রভু তৃতীয় শ্লোক বললেন—এমন করে নাম করলে নামে রুচি হবে।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (৩)

চৈ. চ. অন্ত্য—২০।২১

তৃণ অপেক্ষা সুনীচ হতে হবে। আর হ'তে হবে, তরুর মত সহিষ্ণু। তৃণের মত মানে, তোমাকে পদদলিত করলেও প্রতিশোধ নেবার জন্য মাথা তুলবে না। গাছকে ঢিল মারলে গাছ প্রতিশোধ তো নেয়ই না বরং যে আঘাত করে, তাকে নিজের ফল দান করে আর ছায়া দিয়ে, আপ্যায়িত করে। নিজে অমানী হয়ে সর্ব্ব জীবকে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জেনে সম্মান দেবে।

এমন করে যে নাম করবে তার জন্য প্রার্থনা চাই। প্রার্থনাটী হবে এমন যে, প্রভু আমি যেন এমন দীন হতে পারি।

ভক্তিরসামৃতে সিন্ধুতে এই প্রার্থনাকে বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে। হরিকে উদ্দেশ করে যা কিছু বিজ্ঞাপন করা হয়, জানানো হয় তাকে বিজ্ঞপ্তি বলে। এই বিজ্ঞপ্তি ভিন্নপ্রকার। ১। সৎ প্রার্থনাময়ী ২। দৈন্যাত্মিকা ৩। লালসাময়ী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব বিভাগ দ্বিতীয় লহরী)

চতুর্থ শ্লোকে প্রভুর এই সৎপ্রার্থনাময়ী বিজ্ঞপ্তি বা প্রার্থনা পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি এই শ্লোকে শুধু শ্রদ্ধা-ভক্তিই কৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করছেন।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি। (৪)

চৈ. চ. অন্ত্য ২০।২৯

হে জগদীশ্বর, আমি ধন চাইনা। জন চাইনা, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কিছু চাইনা, সুন্দরী কবিতাও চাইনা। কবিতা অর্থাৎ পাণ্ডিত্য বিদ্যাগৌরবও চাইনা। জন্মে জন্মে হে ভগবান, তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি নিষ্কাম অনুরাগ জন্মে।

এই ভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজেকে দাসরূপে নন্দনন্দন শ্রীহরির চরণে আত্মনিক্ষেপ করে পঞ্চম

শ্লোক বলছেন। যেটী দৈন্যবিরোধিকা বিজ্ঞপ্তি। কেননা নিজেকে দুর্ব্বল বোধ করে ভগবানের পাদপদ্মে শরণ নিলেন।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ (৫)

চৈ. চ. অন্ত্য—২০।৩২

ক্রমে ক্রমে প্রপন্নভাব এসে তাঁর হৃদয় অধিকার করেছে। এমনি করে সাধকের প্রাণেও সাধনার ক্রম অনুসারে সাধ্য-পদার্থ সম্বন্ধে সম্ভ্রমের উদয় হয় বলে তাঁর চরণে দাসরূপে আত্মনিবেদন করেন।

শ্রীভগবানের নামগ্রহণে এই প্রবল উৎকণ্ঠা জাগলে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, কম্পাদি সাত্ত্বিকভাববিকার সমূহ অনুভব ও আস্বাদন করার জন্য তীব্র আকাঙ্খা জেগেছে। তাই তিনি প্রাণের আবেগে বিহ্বল হ'য়ে ষষ্ঠ শ্লোক উচ্চারণ করলেন। লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি একে বলা যায়।

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥" (৬)

চৈ. চ. অন্ত্য ২০।৩৬

এইবার শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মনে বিরহের ভাব জেগে উঠেছে। নিশ্চয়ই তীব্র উৎকণ্ঠা ও দৈন্যভাবের উদয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের রূপটী ফুটে উঠেছিল। এই মিলনের ভাবটীর পরেই বিরহস্ফূর্ত্তি তাই বললেন—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।

(৭) চৈ. চ. অন্ত্য ২০।৩৯

গোবিন্দবিরহে আমার এক নিমেষ যেন এক যুগের মত দীর্ঘ হয়েছে—চক্ষু যেন ঘোর বর্ষা, সর্ব্বদা প্রবলভাবে নয়নধারা পড়ছে। সমস্ত জগৎ শূন্য বলে বোধ হচ্ছে।

"উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিখে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥"

চৈ. চ. অন্ত্য—২০।৪০—৪১

ভগবান একবার দেখা দিয়ে ভক্তের লালসাবৃদ্ধির জন্য অন্তর্হিত হন। অদর্শনের পর এই বিরহ সাধনজগতে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়। তখন ভক্ত সমস্ত চিত্তবৃত্তি অন্তর্ম্মুখী ক'রে, যাকে ভালবাসেন, তারই সেবার জন্য তারই তৃপ্তির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর নিজের সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি ঘটে। নিজের সুখসুবিধা ও আরামের অনুসন্ধান থাকে না। এ এক অপূর্ব্ব অবস্থা। সাধক নিজের আরাধ্য দেবতার চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করেন। এই অবস্থা অষ্টম বা অন্তিম শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীরাধাভাবে প্রভু বলছেন—সখি, আমি আর কিছু আমার জন্য চাই না।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ (৮)

চৈ. চ. অন্ত্য ২০।৪৭

হে সখি, সেই কৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন করে নিজ দাসীত্বে গ্রহণ করুন অথবা চরণে নিপতিত ক'রে আমাকে নিষ্পেষিত করুন অথবা যাহা ইচ্ছা, সেই লম্পট আমার প্রতি যেইরূপ আচরণ করুন, তথাপি তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, আর কেহ নহেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শিক্ষার চরমে এই শ্লোকটি শিক্ষাস্থলে ব্যক্ত করলেন যে শ্রীরাধা দাস্যভাবে ভাবিত ভক্তেরও এই অবস্থা। তিনি তাঁর হৃদয়বল্লভ কৃষ্ণের সুখ ছাড়া আর কিছু চান্‌না।

"আমি কৃষ্ণপদদাসী তিঁহ রসসুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন না জানে মোর তনুমন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ। অন্ত্য ২০।৪৮

সখি হে, শুণ মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়॥ অন্ত্য ২০।৪৯

না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য
মোরে যদি দিয়ো দুখ তার হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য। অন্ত্য ২০।৫২

কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান। অন্ত্য ২০।৫৮

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম
আত্মসুখের যাহাঁ নাহি গন্ধ
স্ব-প্রেম জানাইতে লোকে প্রভু কৈলা এই শ্লোকে
পদ কৈলা অর্থের নির্বন্ধ।
চৈ. চ. অন্ত্য ২০—৬২

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু পরমদয়াল গৌরকিশোর বিনা আমাদের ব্রজের এই বিশুদ্ধ প্রেম কে জানাতো? তাই, এই শিক্ষাষ্টকের মূল্য সাধনজগতে সাধকগণের কণ্ঠহারমণির তুল্য অথবা তার চেয়ে বহুগুণে মূল্যবান, কেননা সাধনার এই ক্রম অবলম্বন করেই সাধকের গৌর গোবিন্দ চরণ প্রাপ্তি হয়, মানবজীবনের চরম সার্থকতা লাভ হয়। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে আমরা যেন এই সাধনতত্ত্ব অবলম্বন করে ধন্য চরিতার্থ হতে পারি।

> "প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপগ্রহণ করিয়াছিল—তাহা বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যরূপে।"
>
> **শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।**

চৈতন্য গুরু শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্য

ডাঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ (এম. এ.; এল. এল. বি.; পি. এইচ. ডি.)।

দীর্ঘ ১২৫ বৎসর ব্যাপী যাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব বাংলার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তিনি হলেন শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্য। চৈতন্যদেব এঁকে 'গুরু', 'আচার্য গোসাঞি', 'বাউল', 'নাঢ়া' প্রভৃতি বলে সম্বোধন করতেন এবং এঁরই আহ্বান ও প্রচেষ্টা যে তাঁর আবির্ভাবের কারণ তা বার বার স্বীকার করেছেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্য স্বয়ং বলছেন—

অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাঢ়ার হুঙ্কার।
শয়নে আছিলুঁ মুঞি ক্ষীরোদ সাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাঢ়ার হুঙ্কারে॥

আবার অন্যত্র অদ্বৈতকে তিনি বলছেন ঃ

যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলে অপার॥

প্রকট লীলা পর্যন্ত চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যকে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির আধার বলে গণ্য করতেন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার লাউর পরগণার নবগ্রামে অদ্বৈতাচার্যের জন্ম। পিতার নাম কুবের মিশ্র, মাতা লাভা দেবী। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল কমলাক্ষ। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে শান্তিপুরে আসেন বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্যে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ষড়্‌দর্শন ও চারিবেদ অধ্যয়ন শেষ করে তিনি 'বেদপঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন এবং আবার শ্রীহট্টে ফিরে যান। পিতৃবিয়োগের পর তিনি প্রায় সারা ভারতব্যাপী তীর্থদর্শনে বের হন এবং এই সময়েই সেতুবন্ধ রামেশ্বরে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মাধবেন্দ্র তাঁর সঙ্গে দীর্ঘসময় ধর্ম ও প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করেন। সারাভারত ব্যাপী পরিভ্রমণের সময়ে তাঁর হিন্দুধর্ম ও তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যা অভিজ্ঞতা তা তিনি মাধবপুরীর সঙ্গে বিশদ আলোচনা করেন।

এই সময়কার সামাজিক অবস্থা খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেশে তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠান রাজত্ব খুবই শক্তভাবে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে। বৌদ্ধধর্ম বিনষ্টপ্রায়। তার বদলে সাধারণ লোকে নানারকম দেবদেবী, পিশাচ, ডাকিনী ইত্যাদি পূজায় ব্যস্ত। সকলেই ঐসব তথাকথিত দেবদেবী বা অতিমানব-মানবীর সাহায্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা চায়। স্বীয় কর্মক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা বা যোগ্যতার দ্বারা জীবনে সফলতালাভ করার কোন উদ্যোগই দেখা যায় না। অপরদিকে সমাজকর্তাদের নিত্যনূতন বন্ধনের ফলে জনসাধারণের মনে ক্ষোভ আর হতাশা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। সমাজ থেকে উদারতাবোধ অবলুপ্ত। তার পরিবর্তে সঙ্কীর্ণতাবোধ সমাজকে সবদিক থেকে জড়িয়ে ধরেছে। নিম্নবর্ণের মানুষ—যারা সমাজের প্রধান শক্তি—তারা অত্যন্ত অবহেলিত। ফলে সমাজের এই শ্রেণীর মানুষ দলে দলে ইসলামের সম-ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে সমাজে স্বীকৃতি লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। সেই সঙ্গে জোর করেও ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার করা হচ্ছে। সমস্ত দিকের বিচারে হিন্দুধর্ম তথা সামাজিক অবস্থা খুবই দুর্দশাগ্রস্ত। কোন ব্যক্তি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে স্বল্পমাত্র অহিন্দুসুলভ আচরণ করলে তার পক্ষে আর হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে ফিরে আসার উপায় ছিল না। সমাজের নিয়ন্ত্রক ছিলেন অতি অল্পসংখ্যক প্রতিপত্তি-লোভী ব্রাহ্মণসমাজ। এঁরা নিজেদের অধিকার ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার লোভে বিধর্মী রাজশক্তির সঙ্গে একধরণের আঁতাত গড়ে তুলে সমাজের উপর নিজেদের হীন কূপমণ্ডূকতা বজায় রাখতেন। এর বাইরে আরও অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এই সমাজকর্তা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারতেন না বা পারেন নি। চৈতন্য-চরিতকাররা এই প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের 'পাষণ্ডী' বলে আখ্যাত করেছেন।

সামাজিক অধোগতি, অনাচারে ব্যথিত কমলাক্ষ বার বার মাধবেন্দ্রপুরীকে বলতে থাকেন সর্বত্র স্বেচ্ছাচার।

কীভাবে যে এর থেকে দেশ, জাতি, ধর্ম তথা সমগ্র মানব-সমাজকে মুক্তি দেওয়া যাবে তা খুঁজে পাচ্ছেন না—'কৈছে জীবোদ্ধার হইব না পাঁও সন্ধান'। মাধব তাঁকে উপদেশ দিলেন 'তুমি চিন্তা কর, 'পথ পাবে। 'পুরী কহে কমলাক্ষ তুমি দয়ানিধি। জগতের হিত লাগি ভাব নিরবধি॥'

তীর্থভ্রমণ থেকে ফিরে এসে তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হ'ল কী করে সমাজকে তথা হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা যায়। সেইসঙ্গে অধ্যাপনাও শুরু করেন। পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইসময়েই তাঁর কাছে হরিদাস জ্ঞান আহরণের জন্য এলেন। হরিদাসের পূর্ব পরিচয় বিশেষ জানা যায় না। তবে তিনি বার বার নিজেকে ম্লেচ্ছ বা যবন বলে পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী কালেও তিনি কোনদিন পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করেন নি। তিনি সুদেহী ও দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। আবার তাঁর মায়ের নাম উজ্জলা বলেও দেখা যায়। সমস্ত দিক বিচার করে মনে হয় তাঁর পিতা কোন পাঠান ছিলেন। মাতা হয়ত এদেশী কোন নারী। যাই হোক্ ম্লেচ্ছ ধর্মাবলম্বী হরিদাস তাঁর বাড়ীতে এসে বিদ্যার্জন করতে চাইলেন। সহসা যেন অদ্বৈতাচার্য তাঁর মতাদর্শ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা তৈরী করে ফেললেন। হরিদাসকে অবলম্বন করেই অদ্বৈতাচার্যের অন্তর্নিহিত বিদ্রোহী শক্তির প্রকাশ ঘটে। তিনি ম্লেচ্ছ হরিদাসকে শুধু বাড়ীতে জায়গাই দিলেন না তাঁকে তিলক কৌপীন পরিয়ে, মস্তক মুণ্ডন করে একজন বৈষ্ণব হিসাবে দীক্ষা দিলেন। আপন মাতৃশ্রাদ্ধের পর তাঁকে সেই শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করালেন। সমাজকর্তা 'পাষণ্ডী' ব্রাহ্মণ-শ্রেণী একজন ম্লেচ্ছকে বাড়ীতে শুধু জায়গা দেওয়াই নয় তাঁকে পূর্ণ হিন্দুর সম্মান দেওয়ায় খুবই বিচলিত হয়ে উঠে, অদ্বৈতকে সমাজচ্যুত করবার ভয় দেখান। সংকুচিত, বিনয়ী হরিদাস স্বয়ং অদ্বৈত-আশ্রয় থেকে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অদ্বৈত এই সমাজকর্তাদের ভ্রূকুটিতে বিচলিত হওয়ার মত ব্যক্তি নন। তিনি হরিদাসকে বললেন 'আচার্য কহেন তুমি না করিহ ভয়। সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥' এই সময়েই হরিদাস ও অন্যান্য কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে সীতাদেবী ও শ্রীদেবী নামক দুই বোনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

অদ্বৈত তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনায় সর্বদাই হিন্দুধর্মের গ্লানি, সমাজদেহের ব্যাভিচার তথা সামগ্রিক-ভাবে মানব-মুক্তির জন্য পথ খুঁজেছেন। এইজন্য তাঁর উদ্দিষ্ট 'কৃষ্ণের' আবির্ভাবের জন্য সদা—চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। 'হুংকার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে। সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥' কখনও বা 'কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিলা। জলতুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিলা॥' তাঁর এই হুংকার, তাঁর এই পূজা, তাঁর এই সাধনা সব কিছুই হিন্দুধর্মের ও সমাজ ব্যবস্থার অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে এবং তাদের মঙ্গলের জন্য যোগ্য পথের দিশারীর সন্ধানে। ইনিই তাঁর 'কৃষ্ণ'—পরবর্তীকালে যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে প্রতিভাত হন। ব্যক্তিগত জীবনে অদ্বৈতাচার্য খুবই নিরভিমানী, নিরহংকার ছিলেন। 'স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্যহৃদয়। জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥'

নবদ্বীপে কাজী ও সমাজকর্তা পাষণ্ডী ব্রাহ্মণেদের অত্যাচারে বৈষ্ণবরা যখন নবদ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সংকল্প করছেন তখন যে ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠেন তিনি হলেন অদ্বৈতাচার্য। এই তাঁর আসল পরিচয়। একদিকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে চান ঠিক তেমনভাবেই বৈষ্ণবদের এই ধরণের ভীরুতারও উচ্ছেদ চান। 'মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুংকার। ক্রোধ দেখি যেন মহা রুদ্র অবতার॥' সমস্ত বৈষ্ণবকে একত্রিত করে বললেন—প্রয়োজনে আমিই শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করব। কিন্তু এই অবিচার ও অন্যায়ের প্রতিবিধান চাই।

'শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বলে॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর॥
সভা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা সকলেরা॥
যবে না পাবোঁ তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীর কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস॥'

পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গকে যখন সাক্ষাৎ 'অবতাররূপে' সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য বৈষ্ণব সমাজ অভিষিক্ত করলেন তখনও দেখি অদ্বৈতাচার্য সর্বাগ্রে এই তরুণ যুবকের পদযুগল নিজ মস্তকে ধারণ করছেন। সমগ্র জাতি তথা মানবাত্মার মুক্তিদূতরূপে তাঁকে গ্রহণ

করছেন। 'অবতার' যোগ্য নেতৃত্বকে গ্রহণ করতে তাঁর মনে কোন দ্বিধা নেই। বয়স, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান,—কোনকিছুই তাঁকে তাঁর অবতারকে সর্বান্তকরণে সাদরে গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারেনি।

অদ্বৈতাচার্যের দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনার ইতিহাসে দেখা যায় যে, হিন্দুধর্মের রক্ষা, সমাজের দুর্দশামুক্তি ও সাধারণ মানুষের উদ্ধারের জন্য তিনি তিনটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে তা পালন করেছেন। প্রথমতঃ রাজশক্তির বিরুদ্ধে, তাঁদের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার মত যে মানসিক শক্তি সমাজ হারিয়ে ফেলেছিল তা পুনরুদ্ধার করা। এর জন্য প্রতিরোধ এবং প্রয়োজন হলে প্রত্যাঘাতও করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুধর্মের দ্বার সকলের জন্য মুক্ত করতে হবে। সর্বপ্রকার অহিন্দুকেই হিন্দুধর্ম আচরণের—হিন্দু হওয়ার সুযোগ দিতে হবে, এবং প্রেম, ভালবাসার দ্বারাই তাদের হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। লোভ, গায়ের জোর কিংবা অত্যাচার দ্বারা এটি কোনভাবেই যেন না হয়। তৃতীয়তঃ হিন্দুধর্মের মধ্যে নারী শূদ্র ইত্যাদি যারা সমাজ কর্তাদের বিচারে অন্ত্যজ শ্রেণী হিসাবে গণ্য হত এবং যারা সর্বপ্রকার ধর্মচর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল তাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম আলোচনা ও চর্চার পূর্ণ অধিকার প্রদান করতে হবে। এসব কাজের জন্য তিনি আড়ম্বরপূর্ণ পূজার্চনার পরিবর্তে সরল নামগানকেই শ্রেয় বলে স্থির করেন।

তাঁর এই মত স্বয়ং চৈতন্যদেব শিরোধার্য করে নেন। এবং এইটিই তাঁর আদর্শ বলে বার বার স্বীকার করেছেন। একদিকে চৈতন্যদেব 'গুরু' বলে অদ্বৈতাচার্যকে আলিঙ্গন করছেন। অপরদিকে অদ্বৈত 'গুরু' বলে চৈতন্যদেবকে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন। সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে ও দৃষ্টান্তে বাঙ্গালীজীবনে যে প্রেমময় রসমূর্ত্তি ফুটিয়াছিল, নবদ্বীপ সে রূপের তরঙ্গে ভাসিয়া গেল।"

দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন দাশ

মহাবিপ্লবী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীসমরেন্দ্র চন্দ্র দেব (প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্ট)

'বিপ্লবী' কথাটির অর্থ হল সর্বাত্মক বা ব্যাপক পরিবর্তনকারী। শ্রীচৈতন্যদেব প্রকৃত অর্থেই একজন মহাবিপ্লবী। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে এক ব্যাপক পরিবর্তনের স্রোত আনে। এর প্রভাব থেকে বাংলার রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রও মুক্তি পায়নি।

আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন সেই সময়কার বাংলার রাজনৈতিক তথা সামাজিক অবস্থা ছিল তমসাচ্ছন্ন। বৌদ্ধধর্ম তখন অবলুপ্তপ্রায়। তার বদলে তন্ত্রাচার দেশময় ব্যাপৃত। আর তারই আড়ালে যতরকম অসামাজিক কার্যকলাপে ও অনাচারে সকলে রত। হিন্দু ধর্মও ঐভাবে শক্তিপূজার নামে যতরকম লোকাচারসম্মত দেবীপূজায় পর্যবসিত আত্মশক্তিহীন জাতি দেব-দেবীর করুণায় মুক্তি পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর। সে সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥

....

যদি বা পড়ায় কেহো ভাগবতগীতা।
সে হো না বাখানে ভক্তি করে শুষ্ক চিন্তা ॥

প্রকৃত ধর্মালোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁদের পাণ্ডিত্যের গর্বে সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীকে খুবই হীনচোখে দেখতেন। ফলে সমাজের বৃহত্তম অংশ স্বীয় ধর্মের প্রতি ক্ষুব্ধ, রুষ্ট।

অপরদিকে রাজশক্তি হিসাবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠানরা তাঁদের ধর্মপ্রচারে ব্যগ্র। তখনও মোগল শক্তি এদেশে আসেনি। পাঠানরা এই ইসলামধর্ম প্রচারে তিনটি প্রধান কৌশল অবলম্বন করে। প্রথমতঃ, ক্ষুব্ধ রুষ্ট হিন্দু সমাজের অন্ত্যজদের কাছে ইসলামী ধর্মের উদারতা ও একত্ববোধের আদর্শকে বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা চলে। সমাজে অপমানিত, উৎপীড়িত বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে এই ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তিতে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠার লোভে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ইসলামধর্ম গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, অত্যাচার ও উৎপীড়নদ্বারা হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা। তিনটি পদ্ধতিই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তাঁরা প্রয়োগ করতে থাকেন। আর উদারতার বদলে হিন্দুধর্ম নিত্যনূতন সংকীর্ণতার বেড়াজাল তৈরী করে ধর্মের অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে তুলতে থাকে। ফলে সামগ্রিক ভাবে হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বজায় থাকবে কিনা তারই সন্দেহ দেখা দেয়। অত্যাচার, অবিচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার শক্তি দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়—প্রতিরোধ ত' দূরের কথা। এই রকম এক দুঃসময়ে মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

বালক গৌরাঙ্গ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজস্বরূপে প্রকাশ হতে থাকেন। কিশোর বয়স পার হবার আগেই তিনি পণ্ডিত রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাণ্ডিত্যের প্রকাশ করেই তিনি শুধু ক্ষান্ত হননি একজন বিশিষ্ট তার্কিক হিসাবেও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আবার পিতৃবিয়োগের পর সেই শ্রীচৈতন্যদেবকেই আমরা সম্পূর্ণ অন্যভাবে পাই। গয়ায় পিণ্ডদানের পর শ্রীচৈতন্যদেব যখন দেশে ফিরলেন তখন তিনি হয়েছেন এক শান্ত কোমল স্বভাবের ব্যক্তি। পাণ্ডিত্যের তেজের পরিবর্তে হৃদয়ের মাধুর্য প্রকাশ পেতে থাকে। এইভাবেই মহাবিপ্লবী শ্রীচৈতন্য তাঁর বিপ্লব সাধনের জন্য জনসাধারণের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

এই সময়ে নবদ্বীপ তথা সারা বাংলায় একদল লোক বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রকৃত ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। সমাজের এই গ্লানি, সাধারণ মানুষের এই ক্লেশ তাঁদের মনকে সর্বদাই আলোড়িত করত। কিন্তু তাঁরা মুক্তির কোন পথ না পেয়ে মুক্তি-দাতার আগমনের আশায় পথ চেয়ে

ছিলেন। এই দলের সর্বাগ্রজ ছিলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। এছাড়া হরিদাস, শ্রীবাস প্রমুখেরাও এই দলে ছিলেন। আর ছিলেন নিত্যানন্দ—যদিও তিনি তীর্থ-পর্যটনের মধ্যেই নিজেকে বেশীর ভাগ সময় ব্যাপৃত রাখতেন। এঁরা ভয়ে ভয়ে শ্রীবাসের বাড়ীতে খোল করতাল নিয়ে কীর্তন আর কোনরকমে ধর্মালোচনা করতেন। কিন্তু তাতেও নিস্তার ছিল না। নিজেদের আধিপত্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ তৎকালীন শাসকের কাছে তাঁদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন। কারণ কীর্তনের শব্দে নাকি তাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটছে। তাঁদের এই আচরণের জন্যই বোধহয় পরবর্তীকালের বৈষ্ণবচরিতকাররা তাদের 'পাষণ্ডী' আখ্যা দিয়েছেন। বিধর্মী শাসকরাও এই সুযোগে হিন্দুধর্ম আলোচনার এই সামান্য পথটিও বন্ধ করবার নির্দেশ দিলেন। ভীত, সন্ত্রস্ত হিন্দুর দল তাঁদের কীর্তন বন্ধ করার ও সামগ্রিকভাবে নবদ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। এই সময়েই দেখি পরম কারুণিক মহাবিপ্লবী শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। জাতির ত্রাতা হিসেবে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ।

প্রথমেই শ্রীচৈতন্যদেব এই সমস্ত মূক, ভীত, সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আশা আর সাহস জাগিয়ে তুললেন। তিনি নির্দেশ দিলেন শ্রীবাসের বাড়ীতে যেমন বৈষ্ণব ধর্মালোচনা ও কীর্তন হয় তা চলবে! শুধু তাই নয় তিনি তাঁর শিষ্যদের আরও নির্দেশ দিলেন যে তাঁরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে হরিনাম প্রচার করবে। যদি কোনরকম বাধা আসে তাহলে বাধাদানকারীদের প্রয়োজনে 'খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলবেন' তাও বললেন—তা সে 'পাষণ্ডীই' হোক্ বা রাজপ্রতিনিধি কাজীই হোক্, অর্থাৎ শুধু প্রতিবাদই নয়—প্রয়োজনে প্রতিরোধও। সেই সময়ে জনগণমানসে এই ধরণের শক্তি যোগান যে কী বিরাট ব্যাপার তা আজও ভাবা যায় না।

কাজীর নির্দেশে বৈষ্ণবদের খোল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নিমাই আচার্য তখন কাজীর কাছে মহাশত্রু। তারই নির্দেশে ও শিক্ষায় জনগণ এই প্রতিরোধ কার্যে লিপ্ত হয়েছে।

'একদিন দৈবে কাজী সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়
কাজী বলে ধর ধর আজি কর কার্য্য।
আজি বা কী করে তোর নিমাই আচার্য্য॥
যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।

(চৈতন্য চরিতামৃত)

ক্রুদ্ধ নিমাই-এর নির্দেশে সব বৈষ্ণবরা দলবদ্ধভাবে রাস্তা দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করতে করতে কাজীর বাড়ীর সামনে এলেন। সমস্ত জনসমাজ যেন রাগে ফুঁসছে। কাজী তাঁর বিপদ বুঝলেন। স্বীকার করলেন তাঁর পরাজয়। হরিনাম করার অধিকার এইভাবেই আদায় করলেন মহাবিপ্লবী শ্রীচৈতন্য। এই হল ভারতের তথা সমগ্র পৃথিবীর প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ।

সমাজের যারা অন্ত্যজ শ্রেণী নিম্নবর্ণের শূদ্র বা অন্য সম্প্রদায় এবং নারীসমাজ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের সর্বপ্রকার ধর্মচর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সমাজ এই অধিকার তাঁদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। সমস্ত ব্রাহ্মণসমাজ অবশ্য এই দলভুক্ত ছিলেন না। শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈতাচার্য প্রমুখেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত লোকধর্মের দেব-দেবীর পূজার সমস্ত রকম অধিকার একশ্রেণীর ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। তাঁদের নির্দেশেই সমাজ, ধর্ম এমন কি ছোটখাট রাজকার্যও পরিচালিত হত। ফলে সমাজের এক বৃহত্তর অংশ সকল ধর্মাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষুব্ধ, রুষ্ট হয়ে ছিলেন। তাঁদের এই ক্ষোভ, রোষ ধর্মত্যাগ করে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করত। শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমেই নির্দেশ দিলেন আচন্ডাল সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিনাম প্রচারের ব্যবস্থা করতে। শুধু তাই নয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী অব্রাহ্মণদের তিনি সকলের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করতেন। এর ফলে একদিকে যেমন জাতিভেদ প্রথার মূলে আঘাত হানা হল অপর দিকে ধর্মাচরণের অধিকারহীনতার ফলে হিন্দু ধর্মত্যাগ করার যে প্রবণতা ছিল তা থেকে সমাজকে বাঁচালেন মহাবিপ্লবী শ্রীচৈতন্য। জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণের তিনিই ছিলেন পথপ্রদর্শক।

তিনি অহিন্দু অর্থৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের হিন্দু ধর্ম গ্রহণের পথে যে বাধা ছিল তা দূর করেন। তাদের তিনি অন্য হিন্দুদের মতই একরকম ব্যবহার করতেন। হরিদাস জাতে ম্লেচ্ছ অর্থাৎ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণব হরিদাস তাঁর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। যখন তিনি জানলেন

যে বাইশ বাজারে কাজীর হুকুমে হরিদাসকে চাবুক মারা হয়েছে তখন তিনি প্রতিকারে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন।

দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নামিনু বৈকুণ্ঠ হইতে সভা কাটিবারে॥

(চৈতন্য ভাগবত)

আবার সংস্থিত হরিদাসকে পরম সমাদরে বালিতে গর্ত করে শুইয়ে দিলেন। তার স্মরণে যে মহোৎসবের আয়োজন করলেন তা যে কোন লোকের পক্ষেই পরম ভাগ্যের কথা। বিধর্মীকে নিজের ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আনা, তার প্রতি এই সম্মান দেখানো এক অভিনব প্রয়াস। পরবর্তীকালে আরও অনেক ইসলাম ধর্মাবলম্বী তাঁর কাছে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে এবং সমাজের সম-সম্মানের অধিকারী হয়। এইভাবে যে তিনি শুধু হিন্দু ধর্মেরই মঙ্গল করলেন তাই নয়—সর্বপ্রকার সামাজিক ভেদ-বুদ্ধির মূলোচ্ছেদ করে এক মহাবিপ্লব সাধন করলেন।

সমাজের নারীজাতির প্রতি সম্মান জানানো, তাঁদের ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া এবং অসহায়, সমাজ পরিত্যক্তাদের সসম্মানে সমাজে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোগী। নিজমাতা শচীদেবী বা স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াই নয়, অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবী বা বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীর প্রতি তাঁর সম্মান ও করুণা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

যেসময় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কায়িকশ্রম করা লজ্জার বিষয় ছিল সেই সময়েই শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখি শ্রমের মর্যাদা দিতে। তিনি নিজে পায়ে হেঁটে তীর্থে তীর্থে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজা বা রাজপ্রতিনিধি তাঁর যাত্রাকষ্ট লাঘবের জন্য অনেক সাহায্য দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করেছেন। নিজে তাঁর আশ্রম ও পরবর্তীকালে নীলাচলে স্বহস্তে গুণ্ডিচা মার্জন করতেন। এই শ্রমের মর্যাদা বোধ সৃষ্টি করা এক বৈপ্লবিক কার্য সন্দেহ নেই।

বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিতে তাঁর দান কোন প্রশ্নের অবকাশই রাখে না। তিনি নাট্যকলায় উৎসাহদানের জন্য স্বয়ং বিভিন্ন নাট্যাংশে অংশগ্রহণ করতেন। সংস্কৃত ছাড়াও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা তিনি শিখেছিলেন সেই স্থানের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য। তাদের কথা জানতে, বুঝতে ও তাদেরকে নিজের কথা বোঝাতে তিনি এই পথ গ্রহণ করতেন। তিনি বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, গুজরাটী ও বিভিন্ন দক্ষিণীভাষা জানতেন বলে প্রমাণ আছে। তৎকালীন সময়ে এই ধরণের জাতীয় সংহতি সৃষ্টির প্রয়াস অভিনব। আর তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যে বিস্তার ও বৈচিত্র্য ঘটেছে তা ত' সকলেরই শ্রদ্ধার বিষয়।

আজ ৫০০ তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্‌কালে সেই মহামানব মহাবিপ্লবীকে স্মরণ করি। শ্রদ্ধাভরে প্রণতি জানিয়ে জাতির এই সংকটময় সময়ে তাঁর পুনরাবির্ভাবের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

চৈতন্যের 'প্রেমা' প্রাণধর্মের মহিমান্বিত-বিকাশের ধারাপথে আবির্ভূত এক স্বর্গীয় অনুভূতি।"

অরবিন্দ ঘোষ

শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণে

অমিতাভ চৌধুরী

এই বাংলা বহু মণীষীর জন্ম দিয়েছে। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম আমাদের প্রেরণা দিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। বাঙালী জাতি গঠনের এক হাজার বছরের ইতিহাসে কত প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ এই শ্যামলজনপদকে গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁদের অকৃপণ দানেই আমরা, উত্তরসূরীরা বাঙালী হিসাবে উন্নতশির। কিন্তু সব ছাড়িয়ে সব ছাপিয়ে একজনের নাম সবচেয়ে উজ্জ্বল। তিনি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

গত পাঁচ শ বছর ধরে চৈতন্য মহাপ্রভু ধনী দরিদ্রের ঘরে, অভিজাত অবজ্ঞাতের হৃদয়ে, নগরে-পল্লীতে সর্বব্যাপী হয়ে আছেন। আমাদের নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে এবং ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে মহাপ্রভুর নাম ও স্থান সর্বাগ্রে। চৈতন্যদেব কলিযুগে কৃষ্ণের অবতার এবং 'রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।' তার সঙ্গে কোন মানবের তুলনা চলে না। কিন্তু সে তো ভক্তের কথা। ভক্তি আছে, থাকবেই, তাকে বাদ দিয়েও অনায়াসে বলা যায়, লৌকিক ও ঐতিহাসিক বিচারে চৈতন্যদেবই প্রথম এবং আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালী যিনি দীর্ঘকাল একটি জাতির ধর্ম-কর্ম-জীবন-মনন চৈতন্যময় করে রেখেছেন।

বাঙালী জীবনে প্রভাবের বিচারে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পর মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বহুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয়। জানতে ইচ্ছে করে মহাপ্রভু সম্পর্কে মহাকবির কোন মন্তব্য আছে কিনা। আছে। প্রচুর আছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে যদি সবচেয়ে বেশি প্রভাব কারও থাকে তবে তা উপনিষদের ও বৈষ্ণব দর্শনের। ১৯২১ সালে বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক চিঠিতে লেখেন—"বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে, তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।"

শ্রীচৈতন্যের জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সেই বাল্যকাল থেকে। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম, তার উপর তিনি চৈতন্যদেবের জীবনী পরম আগ্রহে বারবার পড়েছেন। ১৯১০ সালে আর একখানা চিঠিতে বলেন, "বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী আমি বারবার পড়েছি।" ১৯৩৬ সালে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটা চিঠিতে লেখেন—"প্রথম বয়সে বৈষ্ণব সাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।"

রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবকে নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। ভক্তির সঙ্গে মিশিয়েছেন যুক্তি। তাই শ্রদ্ধা ছিল অপার। প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ, আইন অমান্য আন্দোলন, বিক্ষোভ মিছিলের সংগঠন প্রেমধর্মের প্রচার, সাম্যের ও প্রীতির বাণী বিতরণ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই একটি প্রবন্ধে তিনি বলছেন—"আমাদের বাঙালীর মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যে বাস করতেন না। তিনি সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন! তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।"

'সমূহ' গ্রন্থের দেশহিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও চমৎকার কথা বলেছেন মহাপ্রভু সম্পর্কে।—"চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম জিনিসটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে, এইজন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন, তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেমধর্মের আদর্শ ছিল, তাহা কত উচ্চ তাহা কিরূপ নিষ্কলঙ্ক।"

চৈতন্যদেব বাঙালী জাতিকে সংযুক্ত করেছিলেন বিশ্ব চেতনার সঙ্গে। ভারতচেতনাও তিনি প্রথম জাগান। কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নয়, প্রেমে। আর একটি মন্ত্র ছিল তাঁর। সম-সংকীর্তন। রবীন্দ্রনাথ তাই লেখেন—

"চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের নামের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকী সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গহিল্লোল সহস্রকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্রজনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব, তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি।"

১৯১৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একবার লেখেন "একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন। সেই বৈষ্ণবের জাত নেই।" আর এক জায়গায় বলেন, "হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতিয়েছিলেন মহাপ্রভু। হরিভক্তির মাধ্যমে তিনি জাগিয়েছিলেন ভারতবোধ।"

তাছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ বরাবরের। ব্রজবুলিতে নিজে কবিতাও লিখেছেন। কীর্তনকে তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন। তাই তাঁর রবীন্দ্রসংগীতে বেশি প্রভাব কীর্তনের। তিনি বলেন "কীর্তনসংগীতে বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।"

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা এত প্রবল ছিল যে, তিনি বারবার রবীন্দ্রসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন। কলিযুগের গৌরাঙ্গরূপী অবতার—যিনি কৃষ্ণ ও রাধার যুগল আধার,—তাঁর চরণে প্রণাম জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন—

তাইতো প্রভু, যেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

"আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা না বুঝিলে ব্রজলীলা বুঝিতে পারি না।"

নবীনচন্দ্র সেন

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য

[পাঠবাড়ীস্থ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদাসবাবাজীর পাঠের সঙ্কলন]

শ্রীকৃষ্ণকরুণাসিন্ধু। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন রায় রামানন্দের মিলন হয় তখন, কবিরাজ গোস্বামিপাদ সেই অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণ করেছিলেন—

সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি॥

শ্রীকৃষ্ণকরুণাসিন্ধু—কথা ঠিক। তাতে জীবজগতের যে একটা লাভ তা হয়নি। লাভ হয়নি কেন? সেটা প্রকাশানন্দের বাক্যে আমরা পেয়েছি।—

রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং
যোগাদিবর্ত্মক্রিয়া
মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং
সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ।
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং
প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা-
ভক্তের্বর্ত্মকরীং পরং ভগবত-
শ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণকরুণাসিন্ধু—সবই ঠিক। কিন্তু সেই করুণার উচ্ছলিত প্রবাহ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপেই একটিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণেরই প্রিয়তম অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তির বিগ্রহও শ্রীরাধাঠাকুরাণীর বাঞ্ছাপূর্ত্তির বিগ্রহ।

আপনারা তো অবগত আছেন শ্রীকৃষ্ণের তিনবাঞ্ছা পূরণের জন্যে তিনি গৌর হয়েছেন।

তবে কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ত্তি! স্বয়ং ভগবান যিনি, পূর্ণকাম যিনি—তাঁরও রসজগতের একটা লোভ সৃষ্টি হয়েছে। রসজগতের সীমা থাকে না। তত্ত্বজগতের সীমা থাকে। রস জগতের সীমা থাকলে, রস স্বাদহীন হয়ে পড়ে। তত্ত্ব কি তবে সসীম? তাও নয়, কিন্তু রসমাধুর্য্য তত্ত্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তত্ত্ব যেন বাহন, রস যেন তার উপরে বসে—বাহ্য। তাহলে তত্ত্বে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার উপরে কোনও তত্ত্ব নাই। আর সব ভৃত্য বলা আছে—

একল ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

তাহলে কৃষ্ণ জগতের প্রভু, সকলের প্রভু। কিন্তু আমাদের নন্দবাবা গোপালকে আদেশ করছেন "বাবা গোপাল! আমার পাদুকা আনতো।" গোপাল কিছু বলে না, প্রেমাধীন সে। সে হেলতে দুলতে গিয়ে গিয়ে নন্দবাবার দুখানা পাদুকা মাথায় করে নিয়ে এসে বাবার কাছে দিয়ে দিল।

তাই দেখা যাচ্ছে—তত্ত্বের দিক দিয়ে নন্দবাবা বলতে পারেন না কৃষ্ণকে পাদুকা আনবার কথা। তাহলে তত্ত্বকে বাহন করে, রস তার উপরে বসেছে। রসের অধীন তত্ত্ব। তত্ত্ব কখনও রসহীন হয়না। রসও কখন তত্ত্বহীন হয়না, যদি বা কখনও তত্ত্ব রসহীন হয়, রস কখনও তত্ত্বহীন হয়না, কেন বল্লাম এ কথাটা? যেমন জ্ঞানিগণের ব্রহ্মবস্তু তত্ত্ব বটে কিন্তু রসহীন। কিন্তু শ্রীগোবিন্দ রসরাজ বটে, কিন্তু সতত্ত্ব—তত্ত্বের সহিত বর্তমান। অতএব রস কখনও তত্ত্বহীন হয় না। তাই নন্দবাবা বলতে পেরেছেন—"পাদুকা আন।"

কেমন দেখেছেন! রস আর তত্ত্ব—দুটো কেমন খেলা করছে! যেমন ঘোড়ার উপরে চাপে মানুষে তেমনি তত্ত্বকে বাহন করে তার উপরে রস বসেছে। সুতরাং যে উপরে বসেছে তার অধীনেই ঘোড়াকে চলতে হবে। তাই রসের অধীনে তত্ত্বকে চলতে হচ্ছে। তত্ত্বের শিরোমণি শ্রীগোপাল—

"অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্" (ব্র. সং)।

তিনি পাদুকা আনছেন নন্দবাবার। প্রেমাধীন ভগবান্, বাৎসল্যরসের এই লীলা, আবার তারপর মধুর রস, সেখানে তো কথাই নাই।

শ্রীকৃষ্ণকরুণাসিন্ধু বলা আছে। করুণার সাগর তিনি। কিন্তু তাতে জীবজগতের খুব যে একটা লাভ হয়েছে, তা হয়নি। সরস্বতীপাদ বল্লেন—"রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং"—কোনো ভগবান এসেছেন রাক্ষস দৈত্য বধ করে জগতের উপকার করে গেছেন। কিন্তু সে কতটুকু উপকার?

"যোগাদিবর্ত্মক্রিয়া মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং" কোনো ভগবান এসে যোগাদির পথ প্রকাশ করে গেছেন। সেই বা কতটুকু কাজ!

"সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ"—

আর জগতের সৃষ্টি কার্য্য কোনো ভগবান করেন বা করেছেন। সেই বা কতটুকু কাজ?

"মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং"

কোনো ভগবান এসে পৃথিবী উদ্ধার করে দিয়েছেন। সেই কাজ জীবজগতের পক্ষে কতটুকু কাজ!

বলি এসব কাজ তোমার কাজের মধ্যে হলো না সরস্বতীপাদ? বল্‌লে—না। এ সব কাজ কাজ বটে কিন্তু অল্প অল্প কাজ। এতে করে জীবের দুর্গতি মোচন হয়নি। অনাদিকাল থেকে জীবজগৎ যে মায়ার লাথিটা খাচ্ছে; প্রাকৃতবাসনাগ্রস্ত হয়ে, দেহতে আত্মবুদ্ধি করে; সে লাথিটার অবসান হয়নি। সেটা অবসান হবে কখন? যদি কৃষ্ণ পাদপদ্মে তার প্রেমলক্ষণা ভক্তি জন্মে তবে মায়ার লাথি বন্ধ হবে। সেটা হয়নি, তাই বললেন—"প্রেমোজ্জ্বলায়া মহাভক্তের্বর্ত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তমঃ"—

যে ভগবান এসেছেন প্রেমমহাভক্তির পথ দেখিয়েছেন প্রেমেতে উজ্জ্বল যে ভক্তির পথ—যেমন রাজপথ—আলোক-মন্ডিত প্রশস্ত রাজপথ তাতে মানুষের চলতে কোন কষ্ট হয় না সেই পথ দেখিয়েছেন যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তি। তিনি প্রেমেতে উজ্জ্বল প্রেমলক্ষণা ভক্তির রাজপথ প্রকাশ করে গেছেন তাতে যে-কেউ অন্ধ আতুর পতিত সবাই চলতে পারে। কোন অসুবিধা নাই, কোন ভয় নাই, কোন শঙ্কা নাই, পতনের ভয় নাই।

কৃষ্ণকরুণা সিন্ধু এটা ঠিক তা নাহলে তার গৌর হবার সাধ হতো না। সে করুণাসিন্ধু বলেই তার গৌর হবার সাধ হয়েছে।

করুণাসিন্ধু বটে, কিন্তু তার একটা নিয়ম আছে তো। সিন্ধুর একটা নিয়ম আছে দেখেছেন? যারা সিন্ধু দেখেছেন নীলাচলে গিয়ে, কি অন্যত্র, সিন্ধু দেখবেন। সিন্ধুতীরে নীলাচলধাম, কিন্তু সিন্ধুর তো জল অগাধ, অনন্ত জলরাশি, তরঙ্গও আছে, কিন্তু তীরে তাহলে নগর কি করে আছে? অত জল অত তরঙ্গ কিন্তু নগরকে তো ভাসিয়ে দেয় না। সিন্ধুর একটা মর্য্যাদা আছে নিজের, সে নিজের তটভূমিকে অতিক্রম করে না। আর একটা কারণ আছে—সিন্ধুর জল খেয়ে আপনি আমি বাঁচতে পারব না। কেউ কি বাঁচে না? যারা সমুদ্রে বাস করে—হাঙ্গর কুম্ভীর আদি সমুদ্রজলচারী, তারা ঐ জল খেয়েই বেঁচে আছে দিব্যি। কিন্তু তটস্থ প্রাণী আমরা কেউ বাঁচতে পারব না।

কৃষ্ণকরুণাসিন্ধু বটে কিন্তু তার সিন্ধুর মর্যাদা আছে, সে তটস্থ নগরকে ডুবিয়ে দেয় না। তার নিত্যলীলা-জগতের গণ্ডীর বাইরে যে তটস্থ জগৎ, তাকে সে ভাসিয়ে দেয় না, আর তার যে কৃপাজল, সে জলও নিত্যলীলার সঙ্গী পার্ষদগণই তাতে ভাল বেঁচে আছে আনন্দিত হয়ে, কিন্তু জীবজগৎ বাঁচতে পারে না। সে করুণাজল গ্রহণ করতে পারে না এরা। তৎসম হলে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু জীব তো তৎসম হতে পারে না। তাই করুণাসিন্ধু কৃষ্ণ তিনি চিন্তা করলেন। কি চিন্তা করলেন?—আমি ছাড়া কোথাও তো কৃপাজল নাই, কৃষ্ণ কৃপার সাগর—"কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর"—সেই জলই কৃপা। সেই লবণ জল খেয়ে তো জীব বাঁচবে না। তাই তাদের বাঁচাবার কি উপায়? সাগর যেমন চিন্তা ক'রে, কি করেছে, না, সে একটা বুদ্ধি করেছে। ভাবে আমার জল তো নোনা, তটস্থ প্রাণী বাঁচবে না। এখন কি করে ওদের বাঁচান যায়! তাই সাগর সূর্যকে বলেছে—তুমি এক কাজ কর, তোমার কিরণের দ্বারা আমার জলকে তুলে নাও। আকর্ষণ করে মেঘের মধ্যে সঞ্চার কর। আর মেঘকে বলে দাও তারপর সে বর্ষণ করুক। আমার জল তোমার কিরণের দ্বারা সঞ্চারিত হবে মেঘেতে যাবে, আর মেঘ যখন বর্ষণ করবে সেটায় আর নোনা ভাব থাকবে না। সমস্ত জীব জগৎ তটস্থ প্রাণী বেঁচে যাবে।'

তেমনি শ্রীকৃষ্ণকরুণাসিন্ধু—চিন্তা করেছেন, করে গৌর হয়েছেন—

"চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

শ্রীরাধা-দামোদর দুজনে চিন্তা করেছেন। স্বয়ং করুণাময়ী, স্বয়ং করুণাময় দুজন চিন্তা করে গৌর হয়েছেন। কেন? জীবজগৎকে বাঁচাবার জন্য। এ পর্যন্ত জীবজগৎ পায়নি তাদের কৃপাজল, যে পেয়েছে অতিসাধন করে, সে বিন্দু বিন্দু পেয়েছে; তাতে তৃপ্তিজনক কিছু হয়নি। এবার

তৃপ্তিজনক জল পাবার জন্য গৌর হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

"সঞ্চার্য রামাভিধভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং প্রযাতি॥"

আমি পূর্ব্বে নিবেদন করলাম—সমুদ্র যেমন তার জল তটস্থ প্রাণী খেয়ে বাঁচে না তাই সমুদ্র চিন্তা করে সূর্য্য কিরণের দ্বারা তার জল মেঘে সঞ্চারিত করে; মেঘ যখন বর্ষণ করে তখন আর নোনা ভাব নাই। তাই সাগর হল কে এখানে? গৌরাব্ধি। গৌর হলো সাগর। গৌর এখন সাগর হয়েছেন। কৃষ্ণচন্দ্র করুণাসাগর ছিলেন, কিন্তু এখন গৌর হয়ে, সেই সাগরের বিতরণ লীলা আরম্ভ হয়েছে। কি হয়েছে? "সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে—রামাদি-ভক্তমেঘে সেই নিজের কৃপাজল "সঞ্চার্য্য"। কৃপা হলো সূর্য্যকিরণ, তার দ্বারাই জলকে আকর্ষণ করে রামানন্দ রায় মেঘেতে সঞ্চারিত করেছেন।

জলটা কি এখানে? গৌরসাগর বুঝলাম। তার জলটা কি? "স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি"—নিজভক্তি সিদ্ধান্ত। স্বশব্দ দেওয়া আছে। শুধু ভক্তিসিদ্ধান্ত বলেন নি। বলেছেন—স্বভক্তিসিদ্ধান্ত। নিজভক্তি সিদ্ধান্ত সমূহ অমৃত মানে জল। মহাপ্রভুর নিজের যে ভক্তিসিদ্ধান্ত। বলি মহাপ্রভুর নিজের ভক্তিসদ্ধান্ত কিছু আছে না কি? বল্লে—আছে। চৈতন্যচরিতামৃত পড় দেখতে পাবে সিদ্ধান্ত কি রকম। গোবিন্দ সেবক ছিল। মহাপ্রভু গম্ভীরায় আড় হয়ে শুয়ে আছেন দরজায়। গোবিন্দপদ সেবা করবে, তারপর মহাপ্রভু ঘুমোলে নিজে এসে প্রসাদ পাবে। মহাপ্রভু আড় হয়ে শুয়ে আছেন। এখন গোবিন্দ কি করে? গোবিন্দ মহাপ্রভুকে ডিঙিয়ে গিয়ে সেবা করছেন। মহাপ্রভু ঘুমিয়ে গেছেন, বসে আছে গোবিন্দ। মহাপ্রভুর যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে তখন জিজ্ঞাসা করলেন—"গোবিন্দ তুমি প্রসাদ পাওনি?" বল্লে—'আজ্ঞে না'। 'কেন?' 'আমি কি করে যাব তোমাকে লঙ্ঘন করে?' তখন মহাপ্রভু ছল ধরেছেন—"এলে কি করে?" তখন গোবিন্দ বলে—"এলাম তোমার সেবার জন্যে, যাব তো আমার সেবার জন্যে, তাতো হয় না।" এই যে গৌরের—স্বভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ হলো জল, সেই জল রামানন্দ রায়ের মধ্যে—রামানন্দ রায় মেঘ তাতে সঞ্চারিত করেছেন করে রামানন্দ রায়কে বলেছেন—"তুমি বর্ষণ কর।" "বল রায় সাধ্যের নির্ণয়" রামানন্দ বলে বলে যাচ্ছেন। "প্রভু কহে—এহ বাহ্য আগে কহ আর।"

রামানন্দ রায় বলেছেন—"আমি নট তুমি সূত্রধার। তুমি আমাকে যেমন নাচাচ্ছ তেমনি নাচ্ছি। কি বল্ছি জানিনা। তুমি যেমন বলাচ্ছ তেমনি বল্ছি। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, তুমি যেমন বাজাচ্ছ তেমনি বাজ্ছি।"

সেই রামানন্দ রায় বর্ষণ করছেন। প্রভু বলেন—"এহ বাহ্য আগে কহ আর।" আবার কখনও বলেছেন—"এহ হয় আগে কহ আর।" আবার বলেছেন—"এহ উত্তম আগে কহ আর।" পরপর বলে যাচ্ছেন রামানন্দ রায়, বর্ষণ করে যাচ্ছেন—স্বভক্তিসিদ্ধান্ত যা রামানন্দকে দিয়ে দিয়ে দিয়েছেন কৃপাসূত্রে। তখন তো দেখা যায় না। রামানন্দের মধ্যে মহাপ্রভুর যে নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ সঞ্চার করে দিয়েছেন, সেটাতো দেখা যাচ্ছে না। যেমন দেখা যায়না সূর্য্য নিজের কিরণ দিয়ে সমুদ্রের জল যখন টেনে নেয়। দেখা যায় কখন? যখন মেঘের থেকে বৃষ্টি হয় তখন দেখা যায়। তেমনি রামানন্দের মধ্যে নিজের কৃপা-কিরণের দ্বারা যখন মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্ত জল সঞ্চার করেছেন তখন সেটা দেখা গেল না। দেখা গেল কখন? রামানন্দ রায় যখন বর্ষণ করেছেন মহাপ্রভুর কাছে, তখন দেখা যাচ্ছে, ভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ প্রকাশ পাচ্ছে।

গৌর এখন সাগর ছিল কিন্তু রত্নাকর হয়নি। নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত জল, রামানন্দ রায় মেঘে সঞ্চার করেছেন। রামানন্দ রায় বর্ষণ করছেন। গৌর সাগর ছিল, এখন সেই জল পেয়ে রত্নাকর হলো। বলি-সাগরই তো রত্নালয়। বলে—না। সাগয় তো জলরাশি। যখন রত্নের জন্ম হয় তার নাম হয় রত্নালয়। সাগরে রত্ন জন্মে বলে সাগরের নাম রত্নালয়। গৌর সাগর ছিল, এখন রত্নালয় হলো। 'তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি'। রামানন্দ রায় যেসব সিদ্ধান্ত বর্ষণ করেছেন—মাদনাখ্য মহাভাব পর্য্যন্ত। রাধা প্রেমের চরম অবস্থা। সেই স্বাদে মুগ্ধ অনুভবকর্ত্তা মহাপ্রভু। তজ্জ্ঞত্ব—রামানন্দ রায়ের বর্ষণ করা ভক্তিসিদ্ধান্ত জলরাশি সব তিনি অনুভব করতে পেরেছেন। এটাই হলো রত্নের জন্ম। ভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করা এটার নাম রত্ন

জন্ম। আমাদের যেমন এই ভক্তি সিদ্ধান্তের কোনও বোধ নাই। যেমন ধরুন বলা আছে—

গোকোটী দানে গ্রহণে চ কাশী
মাঘে প্রয়াগে কোটিকল্পবাসী।
সুমেরু-সমতুল্য-হিরণ্যদানে
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দনামে॥

এই ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুভব আমাদের আছে কি? যদি থাকত অনুভব, তাহলে আমি গোবিন্দ নাম ছাড়া কোনো অনুষ্ঠান করতাম না।

রামানন্দ রায় যতগুলি ভক্তিসিদ্ধান্ত বর্ষণ করেছেন, মহাপ্রভু সব অনুভব করেছেন। তজ্জ্ঞাতা, এই ভক্তি সিদ্ধান্ত অনুভব করাটাই রত্নের জন্ম। মহাপ্রভু ভক্তি সিদ্ধান্তের সাগর ছিলেন; এখন অনুভব করার পরে তিনি 'রত্নালয়তাং প্রযাতি'। তিনি রত্নালয় হলেন—এখন এই মহাপ্রভু।

গৌরাঙ্গ স্বরূপে আপনি রাধা দামোদর বলুন, গোবিন্দ বলুন রাধেশ্যাম বলুন—তারা সবাই মিলে গৌর হয়েছেন তো। তিন বাঞ্ছা পূরণের জন্য গৌর হয়েছেন। তাই শুধু নয়, ভক্তি সিদ্ধান্ত জল, করুণাসিন্ধু পরবর্ত্তী জীব—তটস্থজীব—বৃক্ষলতা পশুপক্ষী—মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে যে সব জীবরাশি—তারা গোবিন্দের নিত্যলীলার জল খেতে পারে না। তাদের জন্য কি হবে উপায়? তাই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে তিনি জীব জগতের সেই নিত্যলীলার কৃপাজল—ভক্তিসিদ্ধান্ত জল—তাই জীব জগৎকে বিতরণ করলেন রামানন্দ রায় মেঘে দ্বারা।

কৃষ্ণচন্দ্র করুণাসিন্ধু সেই সিন্ধুটা সার্থক হলো কখন? না—যখন সিন্ধুর জল সকলে পেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করলো। তখন সার্থক হলো। জীব-জগৎ এখন হরি বোলে নাচে, প্রেমে নাচে। যেটা বৈকুণ্ঠের সম্পদ্ ছিল হরিবলে নাচা, নারদ ঋষি হরিবলে নাচেন, ভগবানের গুণ কীর্ত্তনে নাচেন। কৈলাসে গিয়ে নাচেন, বৈকুণ্ঠে গিয়ে নাচেন, ব্রহ্মাণ্ডে নাচেন—এ নারদের সংবাদ। আজ সেই সংবাদ মহাপ্রভুর কৃপায় কলি জীবের ঘরে ঘরে, প্রতি ঘরে ঘরে বৈকুণ্ঠ।

যেখানে হরিনাম গীত হয় তাই বৈকুণ্ঠ, ভগবান নারদকে বলেছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে
যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি
তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

যেখানে বৈকুণ্ঠনাথ সেটাই বৈকুণ্ঠ। তাই হরিনাম যেখানে সেখানে বৈকুণ্ঠনাথ থাকেন তাই কলি-জীবের ঘরে ঘরে হরিনাম, ঘরে ঘরে বৈকুণ্ঠ বলা হলো।

এই মহাপ্রভুর দান। তিন বাঞ্ছা পূরণ এটা নিজস্ব কাজ. আর জীবজগতে প্রেমভক্তি প্রচার—যেটা কখনো হয় নাই। সেই সম্পদ গ্রহণ করাবার জন্যে—যেটা অনর্পিত সম্পদ—কোন যুগে কোন ভগবান কোন ভক্তকে যাহা দান করেন নাই—স্বভক্তিসম্পদ্—গোপীপ্রেম-সম্পদ্। স্বশব্দ সেখানেও লাগান হয়েছে—স্বভক্তিশ্রিয়ম্—নিজভক্তিসম্পদ্ বললে কি বোঝায়? ভক্তিশ্রিয়ম্ না বলে? স্বভক্তি-শ্রিয়ম্—কেন বললেন গোঁসাই? দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই চার প্রকার সম্বন্ধ-লক্ষণা ভক্তি, তার মধ্যে স্বশব্দে কাকে লক্ষ্য করেছেন? লক্ষ্য করছেন উন্নতোজ্জ্বলরসাম্। উন্নত উজ্জ্বল রস যাতে আছে এমন যে ভক্তি—সেটি স্বভক্তি—নিজভক্তি। আর ভক্তিগুলি নিজভক্তি নয়? হ্যাঁ সেও নিজভক্তি, তবে স্বশব্দটা মধুরেই প্রাধান্য পেয়েছে।

যেমন ভোজনে আপনি যখন বসেন তখন চারদিকে ভাজা, ডাল, তরকারি, রসা, টক, পরমান্ন আছে—মাঝে ভাত আছে। আপনি খাচ্ছেন এমন সময় কেউ এসে ডাকলো "মশায় বাড়ী আছেন নাকি?" বল্লেন—"হ্যাঁ"। "কি করছেন?" আপনি উত্তর দিলেন 'ভাত খাচ্ছি।' উত্তরটা কি ঠিক হলো? মিথ্যা কথা বলছেন আপনি। আপনি কি ভাত খাচ্ছেন? ডাল রসা ভাজা চচ্চড়ি খাচ্ছেন সেগুলো তো বল্‌লেন না। এর উত্তর হলো শাস্ত্রে বলেছেন—'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি'—যেটা ওর মধ্যে প্রধান তাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়। তাহলে অন্নটাই আপনার খাবার দরকার, সেই অন্নটাকে রুচিকর করার জন্যে ডাল ভাজা চচ্চড়ি তরকারি। তেমনি গোবিন্দের অন্ন হলো খাদ্য হলো—গোপী-

তাকে রুচিকর করবার জন্য তরকারী হয়ে আছে দাস্য সখ্য বাৎসল্য।

মহাপ্রভু এই অনর্পিত সম্পদ্ জীব-জগৎকে বিতরণ করেছেন। করুণাসিন্ধু গোবিন্দ। করুণাসিন্ধু রাধা-দামোদর। তাঁদের করুণার সুপ্রকাশ হয়েছে জীব-জগতে, তাদেরই প্রিয়তম অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে। তাই গোস্বামি-পাদগণ বলেছেন—শ্রীমদ্ভাগবত—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আর চৈতন্যচরিতামৃতে তো কথাই নাই —**"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"**।

সুতরাং কলিজীবের উপাস্য দেবতারূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, এটা শাস্ত্রে নির্ব্বাচিত হয়েছে। আমাদের কর্ত্তব্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম আনুগত্যে আমরা যেন নিতাই-গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম উপাসনা করতে পারি।

"শ্রীচৈতন্যের আন্দোলন তথা-কথিত নিম্নবর্গের মানুষের কাছে মুক্তির বার্ত্তা নিয়ে এল।"

—**বিপিনচন্দ্র পাল**

কলিযুগোচিত উপাসনা

শ্রী বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী (পঞ্চতীর্থ)

বলাবপি তথা শৃণু—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

যিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং কান্তিতে অকৃষ্ণ, অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্রপার্ষদ সহিত এমন ভগবানকে কলিযুগে সুমেধাগণ সংকীর্ত্তন প্রধান পূজোপচার দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন।

নিমিরাজার প্রশ্ন ক্রমে নবযোগেন্দ্রগণের অন্যতম করভাজন মুনি বলিলেন—সত্যযুগের মানুষ তপস্যা দ্বারা শুক্লবর্ণ ভগবানের, ত্রেতাযুগের মানুষ যজ্ঞদ্বারা রক্তবর্ণ ভগবানের ও দ্বাপর যুগের মানুষ অর্চ্চনার দ্বারা শ্যামবর্ণ ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে।

কলিযুগের মানুষ কিরকম ভগবানের, কিরকম আরাধনা করিয়া থাকে, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্য করভাজন বলিলেন—

"কলাবপি তথা শৃণু"

অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের আরাধনার কথা তোমাকে বলিলাম, এইবার কলিযুগের আরাধনার কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি বিশেষ অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এই বলিয়া করভাজন পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী বলিলেন—কৃষ্ণবর্ণং ইত্যাদি। করভাজনের মতে যিনি কৃষ্ণবর্ণ, কান্তিতে অকৃষ্ণ, তিনিই কলিযুগে আরাধ্য ভগবান। তাঁহার আরাধনার প্রধান উপকরণ সংকীর্ত্তন। সকলে এই আরাধনা করিতে চাহেন না। যাঁহারা সুমেধা, বিবেকী তাঁহারাই সংকীর্ত্তনের দ্বারা এই ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।

এই ভগবান কে? আমরা ঠিক জানিতে পারিতাম না যদি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাভিষিক্ত গৌড়ীয় আচার্য্যগণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা না করিতেন। ভগবানের শ্লোকে দুইটি বিশেষণ আছে। একটি কৃষ্ণবর্ণ, অপরটি ত্বিষাকৃষ্ণ। এই বিশেষণ দুইটির বিশ্লেষণ করিয়া আচার্য্য জীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন। এই ভগবান্ আর অন্য কোন ভগবান নন, ইনি সেই শচীর দুলাল গৌরহরি। শ্রীজীব 'কৃষ্ণবর্ণং' বিশেষণটি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্বপরমানন্দ-বিলাস-স্মরণোল্লাস-বশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্"। অর্থাৎ যিনি সেইরূপ নিজের পরমানন্দ বিলাস স্মরণের উল্লাস বশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিজে গায়ন করিতেছেন এবং পরম কারুণিক স্বভাবে সকল জনকে সেই কৃষ্ণ নাম উপদেশ দিতেছেন—তিনিই হইতেছেন কৃষ্ণবর্ণ। শচীনন্দন গৌরহরির মধ্যে এই বিশেষণের সার্থকতা সুস্পষ্ট হইয়াছে। তাঁহার জিহ্বা সদা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম গান করিত। নিদ্রিতাবস্থাতেও তিনি কৃষ্ণগান হইতে বিরত হইতেন না। শৌচে (মলত্যাগে) বসিবার সময়েও তাঁহার জিহ্বা কৃষ্ণগান করিত। শৌচে বসে কোনপ্রকার কথাবার্ত্তা কইতে নাই। এই বিধি অনুসরণে শ্রীগৌরাঙ্গ তৎকালে তাঁহার জিহ্বাকে ধরিয়া বসিতেন। তাঁহার এক অন্তরঙ্গ শিষ্যের বচন ভঙ্গিমায় শৌচে সেই জিহ্বা ধরিয়া বসা ব্যবহারটি ছাড়িয়া দেন। পূর্ব্ববৎ তাঁহার তেমনি অহরহ কৃষ্ণকীর্ত্তন চলিতে থাকে।

তিনি যখন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে ঝারিখণ্ডের বন দিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার উপদেশে সেই বনের সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ তাহাদের হিংসাস্বভাব ভুলিয়া মৃগমৃগী প্রভৃতি অন্যান্য পশুগণের সহিত মিশিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিয়াছিল। সুতরাং কৃষ্ণবর্ণ বিশেষণের ব্যাখ্যায় গৌরহরি ভগবানই প্রতিপন্ন হইতেছেন।

কৃষ্ণবর্ণ বলিলে আমরা সাধারণতঃ কালোবরণ যাহার তাহাকেই বুঝি। কিন্তু এ ব্যাখ্যা এখানে অসঙ্গত হইবে। কারণ কলিতে অবতীর্ণ ভগবানের বর্ণ কালো হইবে না। তবে কি বর্ণ হইবে পরবর্ত্তী বিশেষণে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। পরবর্তী বিশেষণটি হইতেছে ত্বিষাঽকৃষ্ণ, ত্বিষা মানে কান্তিতে। অকৃষ্ণ মানে গৌরবর্ণ, কারণ গর্গ মহামুনি যখন নন্দ মহারাজার বাড়ীতে গিয়া কৃষ্ণবলরামের নামকরণ করিলেন তখন কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিলেন—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

ভাঃ

অর্থাৎ গর্গ নন্দ-মহারাজাকে বলিতেছেন—তোমার এই পুত্র যুগে যুগে তনু (দেহ) ধারণ করে। সত্যযুগে ইহার শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, কলিতে পীতবর্ণ (গৌরবর্ণ), ইদানীং এই দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। অতএব ইহার নাম কৃষ্ণ।

অকৃষ্ণ বলিলে শুক্লবর্ণ বুঝায়, রক্তবর্ণ বুঝায় কিন্তু এখানে কলিতে অবতীর্ণ ভগবানের সেসব বর্ণ না হইয়া পীতবর্ণই হইবে গর্গমহামুনির বাক্যের তাৎপর্য্য।

এই গৌর ভগবানের আর একটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" এই বিশেষণের শ্রীজীব-গোস্বামী অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—গৌর ভগবানের ভগবত্তাই স্পষ্ট হইয়াছে এই বিশেষণ দ্বারা। কারণ ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গই পরম মনোহর বলিয়া হইয়াছে উপাঙ্গ—অর্থাৎ ভূষণ স্বরূপ। সে কারণে সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মহাপ্রভাব দৃষ্ট হওয়াতে সেইগুলি হইতেছে অস্ত্রস্বরূপ এবং এই অস্ত্রই সর্ব্বদা একান্তভাবে ইঁহার কাছে থাকার দরুণ পার্ষদ স্বরূপ। তাই, তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হয় নাই—এই অবতারে অসুরদিগকে মারিবার জন্য। কারণ অসুরস্বভাব মানুষেরা ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শনেই অসুর স্বভাব ভুলিয়া গিয়া পরম প্রেমবান হইয়াছে, ভগবানকে ভালবাসিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভালবাসিয়াছে। তাই করভাজন তাঁহার বিশেষণ দিয়াছেন—সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। এই বিশেষণের শ্রীজীবগোস্বামী আরও একটি পরিষ্কার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন অত্যন্ত প্রেমাস্পদ হেতু তাঁহার তুল্যই তাঁহার পার্ষদগণ—শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য মহানুভাবচরণ প্রভৃতি। তাঁহাদের সহিত বিদ্যমান থাকেন যিনি তিনি হইতেছেন সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ। এবম্ভূত ভগবানকে বিবেকীসুবুদ্ধিগণ সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে প্রধান যাহাতে এমন পূজাসম্ভার দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ অন্যকোন পূজার উপকরণ না থাকিলেও কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারাই আরাধনা করিয়া থাকেন। সংকীর্ত্তনের অর্থ হইতেছে বহুজন মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা গান করা।

শিবনারদসংবাদ-সংবলিত সাত্বততন্ত্রে পঞ্চম পটলে শ্রীনারদের যুগধর্ম্মের প্রশ্নক্রমে শিব বলিয়াছেন—কলিযুগের মানুষেরা মন্দভাগ্য, অলস, দুঃখ-সংযুক্ত, শিশ্নোদর পরায়ণ, ক্ষুদ্রদীন ও মলিনচিত্ত। সেই কলির মানুষগণের মুক্তির উপায় মাত্র একটি। সেই উপায় অবলম্বন করিলে তবে মুক্তি পাইবে। সে উপায় হইল কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তন এবং এই কীর্ত্তন সকলের পক্ষে সুখকর। কারণ এই কলিযুগের প্রথমেই ভগবান পুরুষোত্তম অবতীর্ণ হইয়া কলিমলনাশক শুদ্ধ যশ বিস্তার করিলেন।

শ্রীশিব এই কথা কহিতে কহিতে আনন্দে বিগলিত হইয়া বলিতেছেন—হে তাত নারদ! সেই পরমদেব কে জান? তিনি হইতেছেন শ্রীশচীনন্দন। তাঁহার দুইনেত্র, দুইভুজ তপ্তজাম্বুনদপ্রভ গৌরাঙ্গ। তিনি দয়াপরবশ হইয়া ধ্যান-যোগাদি কঠিন সাধন ক্রিয়ার ফল আহরণ করিয়া নিজের যশের মধ্যে রাখিয়া উত্তম বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়া জগদ্গুরু হইয়াছেন। পীতবর্ণ সেই ভগবানকে তন্ত্রমন্ত্র ধারায় অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ভক্তগণ। সত্যাদিযুগে ধ্যান যজ্ঞাদি দ্বারা যে ফল হওয়া যাইত, কলিতে তৎসমস্ত ফলই কীর্ত্তন হইতে পাওয়া যায়। এই জন্য এই কলিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলা হইয়াছে। এই কলিতে সত্যযুগের মানুষ জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে।

যাহা হউক, ভাগবতে নবযোগীন্দ্র উপাখ্যানে—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোকের শ্রীজীব গোস্বামী যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা সাত্বত সংহিতা পঞ্চম পটলে শিবপ্রোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত ঠিক মিলিয়া যাইতেছে।

* * *
* * *
* * * *
* *

ভারত চেতনায় বিপ্লবায়নে শ্রীচৈতন্য

ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী (আদ্যাপীঠ)

ভূমিকাঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দেশে আলোড়ন দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে মহাপ্রভুর চরণ-লাঞ্ছিত স্থানগুলিতে উৎসবানন্দের একটু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

বরাহনগর পাঠবাড়ী—যেটি ভাগবতাচার্যের পাঠস্থান ছিল, সেখানে মহাপ্রভু গঙ্গাপথে এসে উপস্থিত হন। তিনি ভাগবতাচার্যের ভাগবতপাঠ শ্রবণ করেন ও কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী নৃত্য করেন। সেই নৃত্য-স্থানটি অধুনা পাঠবাড়ীর নাটমন্দিরের মধ্যে বেষ্টনীর দ্বারা চিহ্নিত করা আছে। এই পাঠবাড়ী পূর্ব হতে পরবর্তী কালে বিভিন্ন হস্তে হস্তান্তরিত হয়ে ন্যস্ত হয় শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের হস্তে। এটি তাঁর সেবায় ও পরবর্ত্তী কালে তাঁর উত্তর-সূরিগণের সেবার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত ও স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বৈষ্ণব স্থানগুলি 'পাট' হিসাবে খ্যাত, যেমন নিত্যানন্দের পাট, রঘুনাথের পাট প্রভৃতি। কিন্তু এই একটি মাত্র স্থান যেটি ভাগবতাচার্যের পাঠ হিসাবে খ্যাত ছিল বলে এর নাম হয়েছে পাঠবাড়ী।

মহাপ্রভুর পাঁচশো বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হল এই স্মারক গ্রন্থ। মহাপ্রভুর স্মরণে তাঁর বিভিন্ন ভগবত্তার দিক পরিস্ফুট করে বিভিন্ন অনুভবী লেখক লিখেছেন। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জন—যে বৈষ্ণবের কৃপার অপেক্ষায় পড়ে আছে, যার কোন অনুভব নেই, ভগবানের ভগবত্তা বুঝবার মত মন নেই, তাঁর কথা শোনার মত কান নেই বা তাঁর রূপ দেখার মত চোখও নেই—সে কি করে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার দিক প্রকাশ করবে? তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনে আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, ও ধর্মে প্রত্যক্ষগম্য যে বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়েছে, তা উল্লেখ করে কিছু লেখা যায় মনে করেই লেখনী ধরা।

মহাপ্রভু যে যুগসন্ধির ক্ষণে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই ক্ষণটিকে ধরেই আমাদের কথা। সেই মধ্যযুগের রাজতন্ত্র ও সামন্ত প্রভুত্বের সমাজে ধন-ঐশ্বর্য ছিল, বিদ্যাবত্তা ছিল, শাস্ত্রচর্চাও ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল সমাজে ছুত্-মার্গের প্রাবল্য, বিদ্যাবত্তায় মানব প্রীতির অভাব, শুষ্ক শাস্ত্রচর্চায় ঈশ্বরপ্রেমের ঘাট্‌তি। ধনী-দরিদ্রের, বিদ্বান-মূর্খের মধ্যে ছিল আস্‌মান-জমিন্ ব্যবধান। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন মহাপ্রভু।

প্লাবন এলে যেমন গৃহ-মধ্যস্থ সবকিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়, আবার নূতন মহামূল্য কিছু দিয়েও যায়, তেমনি এই মহাপ্রভুর আগমনে সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে ও ধর্মে প্লাবন এসেছে ও নূতন যুগের সূচনা দিয়ে গেছে।

সামাজিক বিপ্লবে শ্রীচৈতন্য ঃ সমাজে ছিল দরিদ্র অস্পৃশ্যের উপর ধনী-সমাজের পেষণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে অস্পৃশ্যের ছায়া স্পর্শ করলে গঙ্গাস্নানের দ্বারা পূত হতে হ'ত—এহেন নবদ্বীপ ধামে নবযুগের আলোক-বর্ত্তিকা হাতে নিয়ে মহামঙ্গল মুহূর্তে মহাপ্রভুর উদয় হল গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে।

তিনি কিন্তু সমাজে এনে দিলেন মহাবিপ্লব—অচ্ছুত্ যবন হরিদাসকে সাদর আলিঙ্গন দিয়ে—

"প্রভু কহে,—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥"

চৈ. চ. মধ্য ১১/১৮৯

"চণ্ডাল—পবিত্র, যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে।
হেন—তোমার এই জীব পাইল দরশনে॥"

চৈ. চ. মধ্য ১৬/১৮৪

হরিদাসকে লক্ষ্য করে প্রভু আরও বলেছেন—

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥"

চৈ. চ. মধ্য ১১/১৯০-৯১

লক্ষণীয়, যবন হরিদাসের দীন-হীন সত্তাটি নিয়ে মহাপ্রভুর অনুরাগ মাঝে মাঝে আতিশয্যের রূপ নিয়েছে।

হরিদাস যে যবন, এ কথাটা হিন্দু বা সমকালীন রক্ষণশীল সম্প্রদায় যেমন উল্লেখ করেছেন অথবা নীলাচলের দেবায়তনে বন্ধ করেছেন হরিদাসের প্রবেশ, ঠিক তার প্রতিবাদ স্বরূপই বুঝি শ্রীচৈতন্য তাঁর কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে হরিদাসের বিনম্র ভক্তিকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছেন ভক্ত সেবার মাধ্যমে। হরিদাস অনাহারে থাকলে তিনি তাঁকে খাইয়ে দিয়েছেন, হরিদাস রোগাক্রান্ত হলে তিনি সেবা করেছেন এবং পরম অন্তিম লগ্নে এই মনীষী যবন-ভক্তের মৃতদেহ স্বহস্তে বহন করেছেন সাশ্রু-লোচনে। হরিদাস-পর্ব তাই সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের জীবনে এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। এভাবে মনে করলে সম্ভবতঃ ভুল হবে না যে, শূদ্র ও অন্ত্যজ ভারতের প্রতি বিশেষ চৈতন্যাবদানের প্রতীক—এই যবন হরিদাস ও চৈতন্যদেবের সম্পর্ক সূত্রটি।

রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডলে শ্রীচৈতন্যঃ মধ্যযুগের ইউরোপে চার্চ ও রাষ্ট্রের মিলিত পাপের বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় অচলায়তনের বিপ্রতীপে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে যে নব্য মানবতার জন্ম হয়েছিল, যে জনগণেশের ক্ষুব্ধ উত্তাল রুদ্র রূপটি প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল, মধ্যযুগের বাংলা তথা সমগ্র পূর্বভারতের মানচিত্রে তার চেয়ে বেশী আলোড়ন আমরা দেখলাম। নবদ্বীপের সেই দীপ্রচেতনাময় যুবাপুরুষ একাধিক সংগঠিত শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। সাথে নিলেন ভারতীয় সমাজের সেই মূঢ়-ম্লান-মূক-কৈতবমলিন 'থার্ড এস্টেট' অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে। আমাদের ইতিহাসের দুর্বলতা—আমরা চৈতন্যদেবের এই ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞের যথার্থ স্বরূপের কোনও বস্তুনির্ভর (Objective) বিবরণী পাই নি। দৈবী ভাবের মহোজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় এবং ভক্তিভাবের প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে ঢাকা পড়ে গেছে ভারতের পূর্বভূখণ্ডের এই হিমাদ্রিসদৃশ মনীষীর কর্মযোগী স্বরূপটি।

রাষ্ট্র ছিল মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীন। দুর্বল অবক্ষয়ী আচারসর্বস্ব হিন্দু-ধর্ম এবং আগ্রাসী মদমত্ত ইসলাম। আমরা তখন শিখেছি শাসনকর্ত্তাকে মানতে, ভয় করতে, স্বকীয় ধর্মকে লুকিয়ে রাখতে কাজীর শ্যেন দৃষ্টির আড়ালে। কাজীর হুকুম—কেউ খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়ে নবদ্বীপের রাস্তায় যেতে পারবে না—

"যাহারে পাইল কাজী, মারিল তাহারে।
ভাঙিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজী বলে,—হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥"

চৈ. ভা. মধ্য ২৩/১০৫-৬

জন সাধারণ কাজীর ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলে না—

"ভয়ে কেহ কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভু স্থানে গিয়া সবে করেন গোচর॥"···১১৫

প্রভু কীর্ত্তনে বাধাদানের কথা শুনে ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করলেন। বল্লেন—

"সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম করে কোন্ জন॥
দেখোঁ, আজি কাজীর পোড়াঙ্ ঘর-দ্বার
কোন্ কর্ম করে দেখো রাজা বা তাহার॥"

চৈ. ভা. মধ্য ১২১-২২

সেই রাত্রে হাজার হাজার ভক্ত মশাল হস্তে হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে করতে কাজীর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং সুসজ্জিত বাগানকে ভেঙে তছনছ করলেন!

"কেহ বলে,—এবে কাজী বেটা গেল কোথা।
লাগি পাঙ এখন ছিঁড়িয়া ফেলোঁ মাথা॥" ২৩২

এই যে হিন্দুধর্মে বাধাদানে সোচ্চার প্রতিবাদ ও দুঃসাহসিক আন্দোলন—এর পূর্বে কোনও ধর্মপ্রচারক করেছেন কিনা জানি না। ধর্মের জন্য রাষ্ট্রের আইনও যে অমান্য করা যায়—এও মহাপ্রভুর প্রেমপ্লাবনের একটি দান।

সাহিত্য চেতনায় নবায়ন-সাধনে শ্রীচৈতন্যঃ সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়েই সাহিত্য। তার চিত্রই ফুটে ওঠে সাহিত্যে। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত (biography) পাওয়া যায় না! মহাপ্রভুর সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে জীবনীসাহিত্যের সূত্রপাত হল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিত হল। প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্য পরবর্তী যুগের একটি সুস্পষ্ট রেখাপাত সাহিত্যে হল। চৈতন্যের পূর্ববর্ত্তী বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক যে সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী আছে তাতে রাধিকার রাত্রি-অভিসার, জ্যোৎস্না-অভিসার প্রভৃতির

কথা আছেন। যেমন—বিদ্যাপতির পদাবলীতে শ্রীরাধিকার রাত্রি অভিসারের পদে দেখি—

"নীলবসন তন ঘেরলি সজনি গে
সির লেল ঘোঘট সারি।"

কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী যুগে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরহরি ঠাকুর, যদুনন্দন দাস প্রভৃতি বহু পদকর্ত্তাদের পদাবলী—সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে ও তাকে সুসংবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জ্ঞানদাসের অভিসারের পদে দেখি—

"চৌদিকে রমণী সাজে ডম্ফ রবাব বাজে
সবে চলে মদন তরঙ্গে।"

এই চিত্রটিতে প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যের তফাৎ লক্ষিত হয়। অভিসারিকা কখনও ডম্ফ রবাব বাজিয়ে, জগতের ঘুম ভাঙিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতে যায় না। জয়দেবের উপদেশ আছে—

"মুখরমধীরং তাজ মঞ্জীরম্"।

কিন্তু চৈতন্যোত্তর পদাবলীতে এই ডম্ফ রবাব বাজিয়ে অভিসারে যাওয়ার চিত্রটীতে চৈতন্যের সংকীর্ত্তনের প্রভাবই লক্ষিত হয়।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালের কীর্ত্তন সমাজে যেটি শ্রুত হয়, সেটি 'গৌরচন্দ্রিকা'। আজ পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণের কোন লীলা পরিবেশন করতে হলে সেই বিষয়ের চিত্তশুদ্ধিকারক গৌরাঙ্গলীলা গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে আগে গেয়ে নিতে হবে। এক কথায় গৌরাঙ্গের শীলমোহর করা রাধাকৃষ্ণের পদ গাইতে হবে। এইভাবে সাহিত্যজগতেও এক প্রত্যক্ষগম্য নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হয়েছে মহাপ্রভুর প্রেম প্লাবনে।

ধর্মের নবজাগরণে শ্রীচৈতন্যঃ কলিযুগপাবন অবতার যে শ্রীমন্মহাপ্রভু তারও উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখি ধর্মের ক্ষেত্রে। বেদ ছিল ত্রৈবর্ণিকের অধিকারে। নারী ও শূদ্রের তাতে অধিকার ছিল না। মহাপ্রভু সেই বেদকে স্ত্রীশূদ্র-নির্বিশেষে বিলিয়ে দিলেন আপামর জনসাধারণের মধ্যে। কলিসন্তরণোপনিষদে যে মন্ত্র আমরা পাই তা ছিল—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রমভঙ্গ করে সেই মন্ত্রই পুনরাবৃত্তি করলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

দিয়ে গেলেন শূদ্র, স্ত্রীলোক, ধনীনির্ধন নির্বিশেষে এই মহামন্ত্র নাম। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস এই লক্ষ্য করেই গেয়ে উঠলেন—

বরণ-আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি দুলহ প্রেমধন
দান করয়ে জগজনে।

উপসংহারঃ এই যে মহাপ্রভুর আগমনে আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে সাহিত্যে ও ধর্মে যে নবীন যুগের প্লাবন দেখা দিয়েছে সেটি প্রত্যক্ষগম্য ও সর্বসাধারণবেদ্য।

শ্রীচৈতন্যের এই সর্বাত্মক কর্মজীবনকেই সমাজতত্ত্ববিদ্ চৈতন্য রেনেসাঁ' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে দীর্ঘ দুই শতক ব্যাপী প্রভাব বিস্তার করার পরে খৃষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদের আরও দুশো বছর অর্থাৎ ইংরাজ শাসনকাল জুড়ে স্বদেশের হিতসাধনে এবং শক্তির বিরুদ্ধে প্রেমের যুদ্ধ ঘোষণার দিনগুলিতেও শ্রীচৈতন্যদেব প্রবল প্রাণসত্তা নিয়ে লক্ষ জনমানসে উপস্থিত হয়েছেন। কারণ যে মানুষ সমস্ত বেদামৃত গলাধঃকরণ করে যুগযুগ পোষিত ও সাধনার পরম সম্পদ মোক্ষ বা অপবর্গকে সুতীব্র শ্লেষে 'পরম কৈতব' আখ্যায় ভূষিত করে একটি ক্ষুদ্র অতিব্যবহৃত শব্দ 'প্রেম' পঞ্চম ও শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ' বলে ঘোষণা করতে পারেন, সেই মহামানবকে চারশ বছর বা আজকে পাঁচশ বছর পূর্ত্তির লগ্নেও যে পরম আধুনিক ও অকপট চিন্তানায়ক বলে মেনে নিই তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

*
* *
*

শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রেমদান লীলা

শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে কালে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আবির্ভাব সেকালে বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশ দুর্য্যোগে সমাচ্ছন্ন —সমাজজীবন নানা বিধিবিধানের নিগড়ে শৃঙ্খলিত— মানুষের জীবন ভোগবিলাসে প্রমত্ত—সাধনার জীবনে অবিশ্বাসের নৈরাশ্য—এই প্রকার পরিমণ্ডলে গৌড় দেশের ভাগ্যাকাশে শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের একটি দিক্ হইল তত্ত্বাশ্রিত রসের দিক্-অপরটি হইল সমাজজীবনের উজ্জীবনের ক্ষেত্রে আবির্ভাবের মূল্যায়নের দিক্। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমাস্বাদনে পূজাপাদ প্রবোধানন্দকৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' গ্রন্থে প্রেমাশ্রুবিগলিত স্বর্ণকান্তি কপট সন্ন্যাসীর রূপটি স্মরণ করি—

প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটি ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটিপ্রহসনম্।
বমন্ত মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটীরিব তনু-
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটম্॥
(ভা.চৈ চ. ২।১২)

অর্থাৎ যিনি প্রেমাশ্রুপ্রবাহে নবজলধরের ন্যায় সুন্দর নয়নকমল যুগল দ্বারা পরিশোভিত—যিনি কোটি কোটি পরমপদকে (বৈকুণ্ঠকে) পরিহাস করিয়াছেন, যিনি বিশ্ববিমোহন গৌরতনুর ছটায় অপূর্ব্বলাবণ্যমাধুর্য্যে কোটি কোটি অমৃতসিন্ধু সৃষ্টি করিয়াছেন—সেই কপট সন্ন্যাস-বেশী ত্রিভুবন শোভাসার শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরিকে বন্দনা করি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই দিব্যরূপটি প্রেমে বিগলিত-রূপ লাবণ্যসিন্ধুর এক অপূর্ব্ব সাক্ষাৎকার। প্রেমের এমন শক্তি রহিয়াছে যাহা উঁচু, নীচু, বঞ্চিত, অধম, পীড়িত, দুর্ব্বৃত্ত, সজ্জন সকলকেই পরাভূত করে। এই প্রেমশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। প্রেমশক্তির অপার মহিমার গৌরব শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজজীবনের আচরণের মধ্য দিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন।

প্রেমই বিশ্বের স্থিতি—প্রেমই বিশ্বের গতি—প্রেমেই বিশ্বের শাশ্বত নীতি— প্রেমই বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

"জীবের লাগিয়া কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে"—এমন সর্ব্বজীবের হিতের জন্য উৎসর্গীকৃত অবতারপুরুষ আমরা শুনিতে পাই না—দেখিতে পাই না।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দিব্য আবির্ভাবের কারণটির সন্ধানকারী শ্রীগৌরলীলার প্রত্যক্ষদর্শী প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেন,

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধারতিকেলিনাগররসাস্বাদৈকসদ্ভাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥
(ভা চৈ. চ. ১০।১২২)

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের চরম তাৎপর্য্য যে শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্য ময়লীলা যাহা শ্রীপাদ বাদরায়ণি রাসপ্রসঙ্গে নিগূঢ়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, বর্তমানে এই বিশেষ কলিতে ব্রজের সেই শ্রীরাধার রতিকেলিনাগর শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীরাধার মাধুরী স্বয়ং আস্বাদন করিয়া বিশ্বজীবে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরবিগ্রহে ভূলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন।

সাধন ও সাধ্য, প্রমা ও প্রমেয়, উপেয় ও উপায়, উপাস্য ও উপাসক ভিন্নাভিন্নভাবে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে দ্যোতিত হইয়াছে। ভজনীয় ও ভজনের মিলিতস্বরূপ হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। শুধু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ভজন দেওয়া সম্ভব নয় কেন না তিনি হইলেন ভজনের বিষয়, যখন তিনি শ্রীরাধারাণীর সহিত মিলিত হইলেন তখন সেই স্বরূপে ভজনের সারমাধুরী প্রদানের সুযোগ ও পন্থার সহজপথ প্রকাশিত হইল।

তাই কলিহত জীবকে ভজনের পরিপাটি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর স্বরূপে প্রত্যেক পরিষদ

পরিকরগণকে ভজনরীতির ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যের প্রাচুর্যতায় কীর্ত্তনানন্দে আনন্দময় পন্থার দিব্য সন্ধান দিলেন !

পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।

শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি এই দুইটি বিষয় অঙ্গীকার পূর্ব্বক ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত স্বরূপে আবির্ভব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গভক্তিলোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম ॥
আরও দেখি—সংকীর্ত্তক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥

প্রেমরসমাধুরী আস্বাদন করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বরূপে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ, পরমকরুণায় রাগানুগা ভজনাদর্শ বিশ্ববাসীকে প্রদান করিলেন।

"অধম দেখিয়া ধরিয়া ধরিয়া কান্দে"

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এই স্বভাবসুন্দর সহজপ্রকাশ।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শিক্ষার মাধ্যমে সদা হরিনাম-কীর্তনের ফলস্বরূপে মানবস্বভাবের কি পরিবর্তন সংসাধিত হয় তাহারই নিগূঢ় ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই কথামন্ত্রের ভিতরে ধৈর্য্য, নম্রতা ও মাধুর্য্যের আদর্শ নিহিত। সর্ব্বপ্রকার আনন্দভাবনার রসদ্বার উন্মোচিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সমগ্র মানবজাতিকে দিব্যপ্রেমের ভাবনার সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। অসাধারণ প্রেম ও প্রজ্ঞার, অনন্ত রস ও মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাঁর আদান-গৌরব নামসংকীর্তন, প্রতি মানুষের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণমন্দির সংস্থাপন, আচার ও আচরণের শুদ্ধতা প্রদান। এই ভাবনার সম্প্রসারণের নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে তিনি প্রেরণ করিলেন গৌড়প্রদেশে প্রেমবিতরণের উদ্দেশ্যে।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পল্লীতে, নগরে, গঞ্জে সুরধুনীর কুলে কুলে শ্রীগৌর নাম, শ্রীহরিনাম প্রচার করিলেন। বরাহনগর পাঠবাড়ী এই মহাতীর্থ। যে তীর্থে রঘুনাথ উপাধ্যায়কে "ভাগবতাচার্য্য" উপাধিতে ভূষিত করিলেন তাঁর বিদ্যা বিনয় শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। ভক্তসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্তনবিলাসে আনন্দ মিলনে রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি রাসরজনীর মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এক অপূর্ব্ব আনন্দ কীর্তন মৃদঙ্গের মঙ্গল আরাব ; করতালের সুচ্ছন্দ ধ্বনি ও ভক্তগণের নৃত্যে মধুপরিমন্ডল গড়িয়া উঠিল। প্রেমমূর্ত্তিমন্তবিগ্রহ শ্রীগৌরহরির দৃষ্টির কারুণ্যে সর্ব্বত্র প্রেমের মধুবর্ষণ হইল।

এক অপরূপ ভক্ত ও ভগবানের মহামিলনতীর্থ বরাহ-নগর পাঠবাড়ী। এই মহাতীর্থের প্রেমাধিকার লাভ করিয়াছিলেন পূজ্যপাদ কীর্ত্তন-প্রচারকার্য্য-সাধকচূড়ামণি শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ। তাঁরই অনুগতজন ও শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুর কৃপানিষিক্ত ভক্তমন্ডলী এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন তাঁদের জানাই অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমাভিবাদন। জয়গৌর। জয় নিতাই ! জয় গৌরভক্তকৃপার !

গোটা কতক শ্লোক থাকলে কি গৌরের ভগবত্তার প্রমাণ হবে ? প্রমাণ তাঁর আচরিত কার্য্যে। তাঁর কার্য্য আলোচনা কর, দেখবে, সে ভগবান কিনা।

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ

মহাজনের দর্শনে শ্রীচৈতন্য দর্শন

শ্রী ক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্তী

জীব মাত্রেরই দর্শন বা চোখ আছে—যা দিয়ে দেখে বা যাকে দেখে, সবই দর্শন। কিন্তু আমরা যে দেখি, তা ঠিক দেখা নয়। বিজ্ঞান বলে—দেখার মত দেখাই দর্শন। অর্থাৎ পাকা দেখাই দেখা। যুগের আবর্ত্তনে জগতের পরিবর্ত্তন। দেখারও রকম ফের হয়। দেখা হয় চোখ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, সকল ইন্দ্রিয় দ্বারে। আমাদের সে চোখও নেই, হৃদয়ও নেই। তাই দর্শনেরও ঠিক নেই। তাই মহাজনের দর্শনে দর্শন করাই সত্যিকার দর্শন—তাঁদের পথের পথিক হওয়াই শ্রেয়ঃ 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত, তাই অপ্রাকৃতে দর্শন পাই না। অর্জুন কৃষ্ণের যোগবিভূতি দেখতে চাইলে কৃষ্ণ বললেন—এ চোখে তুমি দেখতে পাবে না—'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'—সেই দিব্য চোখে তাঁর দর্শন হয়েছিল। তাই প্রকৃত চোখের প্রয়োজন। সঠিক দেখতে হলে কবির চোখে, দার্শনিকের চোখে, বিজ্ঞানীর চোখে দেখতে হয়। এঁরাই মহাজন, এঁরাই ভাগবত। গর্গমুনি বৃন্দাবনে বৃন্দাবনচন্দ্রের নাম রাখতে এসে তাঁকে দর্শন করে—'কৃষ্ণ' নাম রেখেছিলেন—'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।' তিনি দেখলেন—এই শিশুটি চার যুগে এসে চার রকম বর্ণ ধরে। এ বর্ণচোরা ছেলে,—এযুগে কৃষ্ণ বর্ণ নিয়ে এসেছে,—তাই এর নাম কৃষ্ণ থাক। সবাই তা মেনে নিল।

মহাভারতের ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে কৃষ্ণকে দেখেই যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে বললেন—'এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ··· গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু' ॥ তোমরা এই কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান আদি পুরুষ নারায়ণ বলে জানবে। ইনি মায়ায় সকলকে মোহিত করে বৃষ্ণি বংশে লীলা করছেন। গীতায় কৃষ্ণ বললেন—'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ'···। মূঢ়জন আমায় সাধারণ মানুষ মনে করে। 'চণ্ডিদাস' এই মানুষকে দেখেই বলেছিলেন—'শুনহ মানুষ—ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে বাঙালীর জীবন ধারায় নদীয়ায় একটি মহাজীবন আবির্ভূত হয়েছিলেন—যা মাত্র ৪৭ বছরের জীবন চর্য্যার এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। সেই মহাজীবনটির নাম—'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'। বাঙালীর জীবনে সে এক নব অভ্যুদয়! নব জাগরণ! জাতির মুক্তির সে কি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ। 'ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ'। সেই নব জাগরণের জোয়ারে বাঙালী জীবনে শুধু নয়—ভারতের ভাগ্যাকাশেও অভিনবত্বের এক কালজয়ী ছোঁয়া লাগলো। এই মহাজীবনকে দর্শন করতে হলে মহাজনের দর্শনালোকে তাঁকে দর্শন বা অনুভব করতে হবে। সেই দর্শনই প্রকৃত দর্শন। মহাজন সব কালেই আছেন। প্রাচীন অপ্রাচীন দুই আছেন। পুরাণ কাল থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কিছু মহাজনের অন্বেষণে দেখব এই মহাজীবনকে, কে কিভাবে ভাবনা বা অনুভব করেছেন। এটাই হবে আমার—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের পাঁচশ বছর পূর্ত্তি মহোৎসবে মহদনুভবের অনুস্মরণ বা দর্শন।

পুরাণ শিরোমণি ভাগবতে বেদব্যাস মুনি আগেই বলেছেন—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্···' শ্লোক। কলিকালে সুবুদ্ধিরাই সংকীর্ত্তন যজ্ঞে সপার্ষদে অবতীর্ণ গৌরহরির অর্চনা করবে। মহাভারতে তিনিই আবার গৌরহরির সংবাদ দিয়ে বলেছেন—'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ···' শ্লোক। অর্থাৎ সোনার বরণ কেউ একজন, যার সুন্দর মুখে সুন্দর দু অক্ষরের কৃষ্ণ নাম, বরাঙ্গখানি চন্দন মাখা, হাতে সোনার বলয়া, পরে সন্ন্যাসী। কবি 'চণ্ডিদাস' যাঁর উদ্দেশ্যে গাইলেন—'আজু কেগো মুরলী বাজায়, এতো কভু নহে শ্যামরায়। ইহার গৌরবরণে করে আলো, চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥ বনমালা গলে দোলে ভাল, এনা বেশ কোন দেশে ছিল। চণ্ডিদাস মনে মনে হাসে, ঐরূপ হইবে কোনও দেশে॥' কবি 'জ্ঞানদাস' বলেন—'সাধ করি—হেন গোরাগুণ শুনি। শ্রবণ পরশে সরস রস তনু, অন্তরে জুড়ায় পরাণী॥'···'কি কহব শত শত তুয়া অবতার। একেলা গৌরাঙ্গ চাঁদ জীবন হামার'॥

'গোবিন্দদাস' বন্দনা গান—

'জয় শচী নন্দন, ত্রিভুবন বন্দন,
কলিযুগ-কাল-ভুজগ-ভয় খণ্ডন রে— ।
বিপুল পুলকাকুল, আকুল কলেবর,
গর গর অন্তর—প্রেম ভরে— ।
লহু লহু হাসনি, গদ গদ ভাষণী,
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥'

গৌর-আনা ঠাকুর 'অদ্বৈতাচার্য্য তাঁর স্তবরাজে বলেন —'অশেষ-জীবসৌভাগ্য-দ্রুম সম্ভূত-সৎফলম্'। আরও কত কথাই না আছে। অভিন্নতনু 'নিতাই' দু হাত বাড়াই সুরধুনীর কূলে কূলে গেয়ে বেড়ান—

'কহ গৌরাঙ্গ, ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে ॥'

শ্রীচৈতন্য বড়চার কবি 'মুরারি গুপ্ত বলেন—'দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, গোরারূপ না হেরিলে, মরমে মরিয়া যেন থাকি। সাধ হয় নিরন্তর, হেম কান্তি কলেবর হিয়ার মাঝারে সদা রাখি ॥' অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিত 'সার্ব্বভৌম' নবীন সন্ন্যাসী 'কৃষ্ণ চৈতন্যের' মুখে আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনে তাঁকে শত শ্লোকে বন্দনা করলেন—যার একটি শ্লোক—

'বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী।
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥'

কবি 'পরমানন্দ' বড় আনন্দে গাইলেন—'পরশ মণির সাথে কি দিব তুলনা রে পরশ করিলে হয় সোনা। আমার গৌরাঙ্গ গুনে নাচিয়া গাহিয়া রে রতন হইল কত জনা ॥' কাশীর 'প্রকাশানন্দ' যিনি কৈবল্যধাম কাশী-ধামে, 'কৃষ্ণ-চৈতন্যের' ভাবকালি বিকোবে না ঘোষণা করেছিলেন শেষে তিনিও তাঁর কৃপা কটাক্ষে নিজেকে বিকিয়ে দিলেন। তাঁর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে' নিজের দশা প্রকাশ করে বললেন— 'কৈবল্যং নরকায়তে···'শ্লোক। যার বাংলা তর্জমায় দাঁড়ায়—যাঁর কৃপা কটাক্ষের বৈভবে—মুক্তিও নরক, স্বর্গ আকাশ-কুসুম, দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় সর্পবর্গ নির্বিষ, বিশ্বজগৎ সুখময় ও বিধি মহেন্দ্রাদিও কীটতুল্য মনে হয়—সেই গৌর-হরিকে আমি স্তব করি—

চৈতন্য-লীলার ব্যাস 'বৃন্দাবনদাস' যিনি—'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' রচনা করলেন। যাঁর উদ্দেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ (যিনি রসিক ভকতমাঝ) প্রশস্তি গাইলেন—"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥"

সেই বৃন্দাবন দাস বলেন 'দুই বাহু তুলি এই সত্য করি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥' কবিরাজ গোঁসাই যাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের' তুলনা নাই, তাতে পাই 'কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার, নিরন্তর বহে যাহা হইতে। সে গৌরাঙ্গ লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥' তাঁর আর একটি পয়ার

'রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥'

মহাপ্রভুর একান্ত প্রিয় 'শ্রীরূপ' জগজীবকে আশীর্বাদ জানালেন তাঁর 'বিদগ্ধমাধব' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে 'অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ···॥' শ্লোকে, যার ভাবানুবাদে 'কবিরাজ' বলেন 'চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহ গ্রীব সিংহ বীর্য্য সিংহের হুংকারে ॥' সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে। কল্মষদ্বিরদ নাশে যাহার হুংকরে ॥' শ্রীখণ্ডের নরহরিঠাকুর যাঁর সদা সর্ব্বস্ব গৌর তাঁর কথা —

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা ॥
গৌর শব্দ গৌর সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে
নরহরি দাস অনুগত তার চরণে শরণ মাগে ॥'

ঠাকুর নরহরির অনুসরণে 'লোচন' গাইলেন —
'অবতার সার, গোরা অবতার, কেননা চিনিলি তারে।
করি নীরে বাস, গেলনা তিয়াস, আপন করম ফেরে ॥

রূপ বর্ণনে বলেন 'ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে, চরণ উপর দুলে যেছে কোঁচা। বাঁক মল সোনার নূপুর, বেজে যেছে মধুর মধুর, রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা ॥'

প্রাক্ চৈতন্য যুগ থেকে—চৈতন্য যুগে ও উত্তর কালে কত না অগনন চৈতন্যায়ণ রচিত হ'য়েছে যাঁদের

ঠাকুর 'নরোত্তম'। কতই না মনঃশিক্ষা ও প্রার্থনার পদ তাঁর, যার একটি পদাংশ মাত্র উল্লেখ করি।

'গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্মল ভেল তার॥'

মধ্যযুগের অগণিত নামা অনামা গৌড়ীয় মহাজনদের প্রণাম জানিয়ে এবার ঊনবিংশ শতকের মহাজনদের স্মরণ করি।

সর্বপ্রথম স্মরণ করি 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবকে' যিনি দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর নিকট প্রার্থনা করলেন— শুদ্ধাভক্তি। বললেন—কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তি-পথ সহজ পথ। চৈতন্যদেব ভক্তির অবতার। জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরের বারান্দায় বসে ভাব নেত্রে দেখলেন সপার্ষদ নিতাইগৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তন রঙ্গে বাগানে প্রবেশ করছেন—সঙ্গে অগণিত ভক্ত সেই দলে তাঁর কয়েকজন ভক্তকেও তিনি চিনলেন। একথা তিনি মাস্টারকে ('শ্রীম') ও বলরাম বসুকে বলেছিলেন। একদিন সুরেন্দ্রভবনে উৎসবে উপস্থিত আছেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হবে—গোষ্ঠ খোল বাজাইতেছে—খোলের মধুর বাজনা গৌরাঙ্গ মণ্ডল ও তাঁহাদের নাম সংকীর্ত্তন উদ্দীপন করে। কি পদ গাইবেন গায়করা জিজ্ঞাসা করলেন। ঠাকুর বিনীত ভাবে বললেন একটু গৌরাঙ্গের কথা গাও। কীর্ত্তন আরম্ভ হলো, প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা তারপর গান আরম্ভ হলো—

'লাখবাণ কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢর ঢর গোরা মুঁ জাঁউ নিছনি॥
কি কাজ শারদ কোটি শশী।
জগত করিল আলো গোরা মুখের হাসি॥'

কীর্ত্তনে গোরা মুখের বর্ণনা শুনতে শুনতে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। একদিন ঠাকুর স্টার থিয়েটারে গিরীশ ঘোষের 'চৈতন্যলীলা' দর্শন করে গাড়ীতে উঠবেন, এমন সময় একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখলেন? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আসল নকল এক দেখলাম।

(কথামৃত)

এবার স্বামীজীর দৃষ্টিতে দেখি—'একবার মাত্র এক [illegible]ভী প্রতিভা সেই 'অবিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য····· সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানেই ভক্তিমার্গ, সেখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদর পূর্ব্বক চর্চা করিয়া থাকে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।·····তিনি নগ্ন পদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেম সম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন।···তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন।··তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, বেশ্যা পতিত সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল। তাঁহার প্রার্থনা ছিল 'হে জগদীশ আমি ধন জন বনিতা কবিতা কিছুই প্রার্থনা করি না— তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।' ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়। ···' (আমেরিকা হইতে প্রেরিত বার্তা-১৮৯৪)

বিশ্বকবি 'রবীন্দ্রনাথের' চোখে এবার দেখা যাক্। তাঁর বিপুল রচনা সম্ভারে ইতস্ততঃ চৈতন্য দেবের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১০ খ্রীঃ কাদম্বিনী দেবীকে লেখা পত্রের একটি ছত্রে তিনি বলছেন 'এই বৈষ্ণব কাব্য এবং চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যের জীবনী আমি অনেক বয়স পর্যান্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি'··· প্রসঙ্গক্রমে তাঁর 'বৈষ্ণব' কবিতার কিয়দংশ উল্লেখ করি।

'সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি,

কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান, রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে। রাধিকার চিত্ত দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা চুরি করি লইয়াছ কার মুখ হতে?'—কার নয়ন, মুখ, আঁখি? একটি মূর্ত্তি ভেসে ওঠে, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।

কবি 'সত্যেন্দ্র দত্তের' কবিতায় আমাদের ঘরের ছেলেকে দেখতে পাই যাতে মানুষের ঠাকুরালি ধরা পড়ে।

'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদের এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া॥'

এবার অবিভক্ত বাংলার বুলবুল কবি 'নজরুলের' নজরে বাংলার ঠাকুরকে নয়ন গোচর করবো। 'পথে কি দেখলে যেতে আমার গৌর দেবতারে।

যারে কোল যায় না দেওয়া কোল দেয় সে ডেকে তারে॥
নবীন সন্ন্যাসী সে রূপে তার পাগল করে।
আঁখির ঝিনুকে তার অবিরল মুক্তা ঝরে॥
কেঁদে সে কৃষ্ণের প্রেম ভিক্ষা মাগে দ্বারে দ্বারে।
জগতের জগাই মাধাই মগ্ন যারা পাপের পাঁকে,
সকলের পাপ নিয়ে সে সোনার গৌর অঙ্গে মাখে।
উদার বক্ষে তাহার ঠাঁই দেয় সে সকল জাতে,
দেখেছ কি প্রেমের ঠাকুর সচল জগন্নাথে?
একবার বললে হরি, যায় নিয়ে সে ভব পারে॥'

আর একটি কবিতার—

'বর্ণ' চোরা ঠাকুর এলো রসের নদীয়ায়,
তোরা দেখবি যদি আয়।
তারে কেউ বলে শ্রীমতী রাধা, কেউ বলে শ্যাম রায়॥
কেউ বলে তার সোনার অঙ্গে, রাধা কৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে।
কেউ বলে তায়—গৌর হরি, কেউ অবতার বলে তায়॥
তার ভক্ত তারে ষড়ভুজ নারায়ণ বলে,
কেউ দেখেছে তারে শ্রীবাসের ঘরে, কেউ বা নীলাচলে।
দুই হাতে তার ধনুর্বাণ, ঠিক যেন শ্রীরাম।
দুহাতে তার মোহন বাঁশি, যেন রাধাশ্যাম।
আর দুহাতে দণ্ড ঝুলি নবীন সন্ন্যাসী,
তোরা দেখবি যদি আয়'॥

এবার উপসংহারে এ যুগের মহান দুই বৈষ্ণব, পরম গৌর ভোগীকে স্মরণ করবো। একজন শ্রীরাধারমণ চরণ দাস, আর একজন তাঁরই আশ্রিত কীর্ত্তনকেশরী শ্রীরামদাস। এঁরা উভয়েই নিতাই গৌর নাম প্রেমে মাতা মত্ত মধুকর। দুজনেই অকিঞ্চন বেশে মহোল্লাসে দেশে দেশে খোল করতালে নিতাই গৌর চরিত সংকীর্ত্তনে মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। 'শ্রীরাধারণ' রচিত অগণিত পদের একটি এখানে পাঠককে উপহার দিলাম।

'জীবের লাগিয়ে, সন্ন্যাস করিয়ে,
রাধাভাব কৈল গোরা অঙ্গীকার॥
সন্ন্যাস করিয়ে, নীলাচলে বসিয়ে,
রাধা প্রেম কৈল গোরা পরচার॥
স্থাবর জঙ্গম আদি, হরি বলে নিরবধি,
গোরা কৈলা লীলা একি চমৎকার॥
বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী, ভজ নিতাই গৌরহরি,
ভব পারে যেতে চরণ তরী কর সার॥
রাধারমণ দাসে বলে, রেখ নিতাই চরণ তলে,
এই ভজন বিহীন জনে কর পার॥'

অতঃপর 'প্রভুরামের' সংকীর্ত্তনের কয়েকটি আখর মাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশ বছর পূর্ত্তি উৎসবের উদ্‌যাপনে উৎসর্গ করলাম।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য!
একবার প্রাণভরে গাও ভাইরে জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমার সীতানাথের আনা নিধি জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমার নদীয়া বিনোদিয়া
প্রাণ শচী দুলালিয়া আমার শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া
কীর্ত্তন কেলি রস বিনোদিয়া শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া

শ্রীচৈতন্য দর্শনের প্রয়াস মাত্র আমার—

'শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥'

"পরমপবিত্র আত্মা ভারত-তপন।
মধুর গৌরাঙ্গপ্রভু সোনার বরণ॥

দীনবন্ধু মিত্র

রসিক শেখর শ্রীগৌরাঙ্গ

ডঃ মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী

নিখিল বিশ্বসংসারের যিনি মূল কারণ তিনি শ্রীভগবান। তিনি মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসেন, ইহা আর্যশাস্ত্রের একটি অপূর্ব্বদান। এই অপূর্ব্ববার্ত্তাটি আমরা পাইয়াছি স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ হইতেই, ভগবদ-গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে। তিনি বলিয়াছেন প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে। বলিয়াছেন—সম্ভবামি যুগে যুগে, বলিয়াছেন—আত্মানং সৃজাম্যহম্।

তিনি কেন আসেন, আসার প্রয়োজনটা কি তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন স্বমুখে। আসেন—"ধর্মসংস্থাপনায়"—"জগজ্জীবের জীবনের মধ্যে ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য। এই কার্য্যটি তিনি করিতে পারেন না, সর্ব্বময় থাকিয়া। পারেন না গোলোকে বৈকুণ্ঠে বাস করিয়াও। ঐ জন্য তাঁহাকে অবতরণ করিতে হয় এই ধূলিময় ধরণীর বুকেই।

তাঁহার ধরাপৃষ্ঠে আগমন ও আগমনের কারণ লইয়া নানাবিধ আলোচনা করিয়াছেন আচার্য্যপাদগণ। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি আসেন না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি আসিতে পারেন না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মনে হয় যেন আসিয়াছেন। আবির্ভূত ইব।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, আসেন তিনি নিশ্চয়ই। আসেন তিনি যোগমায়ার আবরণে। মানুষ হইয়া আসিয়াও সর্ব্বতোভাবে মানুষ হন না। হন, গূঢ়কপট মানুষ। হন, "মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্"। তাঁহার আগমনের কারণ লইয়া বিচার—তিনি নিজ আগমনের কারণ, নিজ মুখে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই একমাত্র কারণ নহে। যেটি গীতায় বলিয়াছেন ওটি বাহ্যকারণ আর একটি আন্তর কারণ আছে। যেটি ব্যক্ত করিয়াছেন ওটি বহিরঙ্গ কারণ, আর একটি আছে অন্তরঙ্গ কারণ। বহিরঙ্গ কারণটি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ কারণটি আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার অন্তরবেত্তা অন্তরঙ্গ প্রিয়জনেরা। বহিরঙ্গ কারণটি হইল ধর্ম্মসংস্থাপন। অন্তরঙ্গ কারণটি হইল রসের আস্বাদন, আস্বাদন করিতে করিতে বিতরণ।

অন্তরঙ্গ কারণটি প্রিয়তম ভক্তেরা প্রকট করিলেন কোন্ বিচারবলে তাহা বলিতেছি। শ্রুতিশাস্ত্রে পরব্রহ্মের পরিচয় লক্ষণ দুই প্রকার আছে। একটিকে বলে তটস্থ লক্ষণ, আর একটিকে বলে স্বরূপ লক্ষণ। লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাদের পার্থক্য বলিতেছি। অর্জ্জুনের পরিচয় দিতে একজন বলিলেন অর্জুন অভিমন্যুর পিতা। আর একজন বলিলেন, ভারতযুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। ইহার প্রথমটি অর্জ্জুনের তটস্থ পরিচয়, দ্বিতীয়টি স্বরূপ পরিচয়। প্রথমটি তটস্থ লক্ষণ বলি এইজন্য যে অভিমন্যুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও অর্জ্জুন ছিলেন, অভিমন্যুর মৃত্যুর পরও অর্জ্জুন বিরাজমান রহিলেন। সুতরাং অভিমন্যুর পিতৃত্ব অর্জ্জুনের সত্তার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে যুক্ত নহে। ওটি একটি সাময়িক ব্যাপার। আর বীরশ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জুনের সঙ্গে সর্ব্বদাই একীভূত। যখন যেখানেই অর্জ্জুন সত্তাবান, সেইখানেই তাঁহার বীরশ্রেষ্ঠত্ব বিশেষণ সংযুক্ত।

বেদান্ত সূত্র প্রারম্ভে, দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় যাহা হইতে তিনি ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, কারণ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিলেন। সৃষ্ট জগৎ লয় হইয়া গেলেও তিনি চির বিদ্যমান রহিবেন। সুতরাং ওটি তাঁর সাময়িক পরিবর্তন-সহ বিশেষণ বা পরিচয়। শ্রুতিতে ব্রহ্মের আরও পরিচয় আছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, তিনি আদ্যন্ত সীমারহিত। এই পরিচয় ব্রহ্মের সঙ্গে সর্ব্বদাই যুক্ত। ব্রহ্ম যখনই আছেন তখনই তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ এই জন্য এইটি তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ।

তটস্থ লক্ষণ সঙ্গে সম্পর্কিত ব্রহ্মের যত কার্য্য সকলই বহিরঙ্গ। স্বরূপ লক্ষণ সহ সম্পর্কিত যত সব কার্য্য তাহা অন্তরঙ্গ কার্য্য। তাঁহার ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার যে কারণটি তটস্থ লক্ষণ সঙ্গে যুক্ত, তাহা বহিরঙ্গ কারণ। যেটি স্বরূপ লক্ষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, সেটি অন্তরঙ্গ

কারণ। জীব জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধটাই তটস্থ, সাময়িক ব্যাপার, সুতরাং জীবজগতের ধর্মসংস্থাপন কার্যটি বহিরঙ্গহেতু। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়াছি "সত্যং জ্ঞান-মনন্তম্, ইহাপেক্ষাও তাঁহার নিগূঢ় স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন দ্রষ্টা ঋষিগণ, তিনি 'সত্যং' কারণ তিনি সত্তাস্বরূপ। তিনি জ্ঞানং" কারণ তিনি পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ। সত্তাটি শাশ্বত হইলেই তিনি "সত্যং" হন। চিৎস্বরূপতা শাশ্বত হইলেই তিনি জ্ঞানস্বরূপ হন। সৎ ও চিৎ এর একটি মিলনভূমি আছে, সেটি হইল "আনন্দ"। তাই ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ বলিলেই তাঁহার সৎস্বরূপতা ও চিৎস্বরূপতা ফলবলাৎ পাওয়া যায়। তাই শ্রুতির প্রকৃষ্ট উক্তি "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। এই আনন্দ স্বরূপতাকে ঋষি আরও গভীরে গিয়া অনুসন্ধানে জানিয়াছেন—আনন্দ হয় রসের আস্বাদনে। "রসো হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।" সুতরাং রসই তাঁহার স্বরূপ লক্ষণে চরম পরিচয়, তাই শ্রুতির ঘোষণা "রসো বৈ সঃ।" ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপগত পরম চরম পরিচয়।

রস বস্তুটি দুইটি অবস্থায় থাকিতে পারে—আস্বাদিত অনাস্বাদিত। এই ভেদ বস্তুতঃ পক্ষে একটা কথার কথা মাত্র। অনাস্বাদিত রস রসই নহে। রসনা কর্তৃক আস্বাদিত সন্দেশটিই মধুর, অনাস্বাদিত সন্দেশটি মধুর নহে। মধুরতার সম্ভাবনা বিশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ। সুতরাং রস সর্ব্বদাই আস্বাদ্যমান। রস আছে, অর্থই হইল আস্বাদ্যমান অবস্থায় আছে,। রস স্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই আস্বাদ্যমান, যিনি আস্বাদন করেন তিনিও রস। যাহা আস্বাদন করেন তাহাও রস। সুতরাং ব্রহ্ম পুরুষ নিয়তই নিজেকে নিজে আস্বাদন করিতেছেন।

আপনার মুখখানি আপনি দুই রকমে জানিতে পারেন। এক প্রকার পারেন নিজ হস্তার্পণ করিয়া, আর একপ্রকারে পারেন একখানি দর্পণের মধ্যে। হস্তার্পণে মুখের সত্তা ও কোমলতা মাত্র জানিতে পারেন। দর্পণে বিম্বের মধ্যে মুখের সুন্দরতা, স্নিগ্ধতা, হাস্য করুণাদি রসানুভূতির পৃথক্তা ইত্যাদি সব জানিতে পারেন। দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখা অর্থ হইল মুখখানাকে পৃথক করিয়া দেখা। শ্রীভগবান নিজেতে থাকিয়াও নিজেকে জানিতে পারেন। আর তদপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক ভাবে জানিতে পারেন নিজ হইতে পৃথক করিয়া। তিনি একাকীও আস্বাদন করেন আবার এক দুই হইয়া নিজ চিৎ দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করাইয়া নিজ রসস্বরূপতাকে উপভোগ করেন। যখন একাকী থাকেন তখন তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম। যখন তিনি নিজেকে পৃথক্ করিয়া আস্বাদন করেন তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ। যখন আস্বাদনের জন্য দুই হন তখন একজন আস্বাদক, অপর জন আস্বাদ্য, একজন আরাধক অপর জন আরাধ্য।

এই আস্বাদ্য আরাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। এই ভূমি স্থির শাশ্বত। আরাধক ভূমির তর তমতা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতেছে। প্রাতঃ সূর্য্যের একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে। তাহা কিন্তু সকল স্থান হইতে একইরূপ ভোগ্য হয় না। যেখানে পূর্ব্বদিক উন্মুক্ত সেখানে দর্শন উত্তম হয়। একটা সমুদ্রের কিনার হইতে আরও ভাল দৃষ্ট হয়। একটা উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ হইতে অতি উত্তম দর্শন হয়। এই পৃথিবীতে যত স্থান আছে তন্মধ্যে দার্জিলিঙের নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে সূর্য্যের উদয়ের শোভা সর্ব্বাতিশয়ী। প্রত্যহ সেখানে শতশত নরনারী সমবেত হয়। তাঁহারা সেখান হইতে সূর্যদেবের উদয়লীলা দর্শনে পুলকাপ্লুত হয়েন।

আরাধ্য রস স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে আরাধনাকারীর ভূমিকা বহু। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, নারদ, হনুমান, অর্জ্জুন, উদ্ধব সকলেই সেই আরাধ্যের আরাধনা-রত। প্রত্যেক স্থান হইতেই তাঁহাকে আরাধনা করা যায়। কিন্তু প্রাপ্তির তর তমতা আছে, ধ্রুবের পার্শ্বে দাঁড়াইলে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন দেখা যাইবে উদ্ধবের পার্শ্বে দাঁড়াইলে তদপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ দৃষ্ট বা ভোগ্য হইবেন শ্রীকৃষ্ণ। এই আরাধকের ভূমিকার ক্রমোর্দ্ধ চিত্র অঙ্কিত আছে। বর্ণাশ্রম ভূমি, কর্ম্মার্পণ ভূমি, জ্ঞানমিশ্র ভূমি, জ্ঞানশূন্য ভূমি, প্রেমভূমি, ব্রজরসের ভূমি, তন্মধ্যে দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রসের ভূমি। তদুপরি ব্রজসুন্দরীগণের ভূমি, সর্ব্বোপরি গোপীশিরোমণি শ্রীরাধাঠাকুরাণীর ভূমি, শ্রীরাধিকা যেখানে আরাধিকা, তথায় রস স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সৌন্দর্য্য বিলাসমাধুর্য্য সর্ব্বাতিশয়ী। সকলই অতি সুগভীর অতি সুনিবিড়, পরম মনোহারী।

যদি শ্রীকৃষ্ণ মধুরিমা আস্বাদনে কাহারও একান্ত সাধ

জাগে তবে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ পার্শ্বে, অথবা, যিনি আছেন চরণপার্শ্বে তাঁহার পার্শ্বে, তখনই তাঁহার হইবে সেই অসমোর্দ্ধ মধুরিমার অশেষে বিশেষে আস্বাদন চমৎকারিতা।

যদি একদা সূর্য্যদেবের মনে সাধ জাগে দার্জ্জিলিঙের হিমলেয়ের উচ্চশৃঙ্গ হইতে তিনি নিজের উদয়-শোভা প্রত্যক্ষ করিবেন, তাহা হইলে ঘটনাটি কিরূপ হইবে! সূর্য্য যদি উদয়াচলেও থাকেন আর সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া শ্রীরাধার পার্শ্বে দাঁড়ান বা পার্শ্বে দাঁড়াইতে না চাহিয়া যেখানে শ্রীরাধা সেইখানেই দাঁড়ান, তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া; অন্তঃপ্রবেশ করিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে! সেই ঘটনাই ঘটিয়াছিল পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে গঙ্গার সুস্নিগ্ধ কূলে মিশ্র পুরন্দর-পত্নী শচীদেবীর আনন্দময় কোলে। তখন রসাস্বাদনের একটি অনির্বচনীয় চমৎকারিতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল এই তাপদগ্ধ ধরিত্রীর ধূলিময় অঙ্কদেশে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্ত রস। তিনি নিজেকে আস্বাদন করেন বলিয়া রসিক। আর নিজেকে পৃথক্ করিয়া পরম আরাধিকা রাধিকার সঙ্গে একই তনু হইয়া নিজেকে আস্বাদন করেন তখন তিনি রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর। তিনি অনাদিকালে এইরূপে স্বমাধুর্য্য আস্বাদনে নিমগ্ন। তাঁহাকে আমরা নিজ ঘরের লোক, অতি নিজজন করিয়া পাইলাম মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে হোলী লীলার দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যালগনে, কলঙ্কীচাঁদ রাহুগ্রস্ত হইলে, কীর্ত্তনের কলকোলাহলে মাতোয়ারা অগণিত নরনারীর তৃষিত নয়নের পুরোভাগে।

ব্রজের কৃষ্ণ বিলাসী। নদীয়ার গৌর বিলাসীও বটেন বিরাগীও বটেন। অন্তরে রস নির্য্যাসের আস্বাদক হইয়াও বাহিরে হইলেন সন্ন্যাসী। স্বয়ং ভগবান হইয়াও বাহিরে আচার্য্য শিরোমণি। হরি হইয়াও হরিবোল বলিতে আত্মহারা। ব্রজে রস ও ভাবের পৃথক লীলা নদীয়ায় একাত্মতায় লীলা। দুই নিত্য। ব্রজলীলায় রসের আস্বাদনের বৈচিত্র্য। নদীয়া লীলায় ভাব আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য। ব্রজে রসের প্রাচুর্য্য, নদীয়ায় মহাভাবের উদ্বেলতা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচৈতন্য অভিন্ন হইলেও লীলায় ভিন্ন।

গৌরসুন্দর একাধারে রসের ভোক্তা ও রস দাতা। স্বয়ং ভাবোন্মত্ত আবার ভাবোন্মত্ততা প্রদাতা। শ্রীগৌরসুন্দরে ছিল অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য, অনন্যসুলভ পাণ্ডিত্য, স্বভাবসুলভ বিনয় নম্র মধুর ব্যবহার। তিনি সর্ব্বজাতীয় লোকের চিত্তাকর্ষক। তাঁর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্মে আকৃষ্ট হইয়াছিল—ভুবন বিজয়ী পন্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম, সন্ন্যাসী কুলগুরু প্রকাশানন্দ, দুর্বিনীত পাঠান সৈন্য বিজলী খাঁ, দুবৃত্ত ব্রাহ্মণ কুমার জগাই মাধাই। তাঁহার মাধুর্য্যে সমাকৃষ্ট উড়িষ্যার নরপতি প্রতাপরুদ্র, নিষ্কিঞ্চন খোলাবেচা শ্রীধর ঠাকুর, নবদ্বীপের অত্যাচারী চাঁদকাজী, বিরাট ব্যক্তিত্বশালী বাদশাহ হোসেন শাহ। তাঁহার মধুরতায় বিমুগ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ, সরলবুদ্ধি শ্রীবাস, বিষয়স্পর্শশূন্য রঘুনাথ ভট্ট, বার লক্ষ টাকার জমিদার রঘুনাথ দাস। তাঁহার প্রেমময় আকর্ষণে গৃহত্যাগী হইয়াছিল রাজনীতিবিদ্ বৃহস্পতিসম বুদ্ধিসম্পন্ন রূপ সনাতন আর বিপুল বৈভবভোগী রায় রামানন্দ। সকল শ্রেণীর সকল নরনারী শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের সদ্‌গুণ-কদম্বে সমাকৃষ্ট হইয়া পাদপদ্মে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। নদীয়ার রসঘন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সাধ্যসীমা শ্রীরাধাতত্ত্বের আবিষ্কারক, সংকীর্তনৈকপিতা মর্ত্ত্যজগতে নাম-গুণ লীলা-মাধুর্য্যের কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক। তিনি মালী হইয়া বৃক্ষধর্ম প্রাপ্ত হইলেন আর স্বকীয় পরিবারবর্গকে আদেশ দিলেন প্রেমফল বিতরণ কর পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া অবিচারে অকাতরে ঘরে ঘরে যারে তারে। শ্রীগৌর-সুন্দরের যে কত মহাদান, তাহা "এক মুখে কত কব বলরাম দাস"।

তথাপি তাঁহার মুখ্য দানটি বিচার করিয়া অনুধাবন করিব। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের মহাদানটি এক কথায়—রস-প্রস্থান। শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় ইহা শ্রুতি-প্রস্থান, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অনুধ্যান করা যায় ইহা স্মৃতি-প্রস্থান, "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" হইতে "অনাবৃত্তি শব্দাৎ" পর্য্যন্ত ৫৫৫ পাঁচশত পঞ্চান্নটি ব্রহ্মসূত্রের বিচার বৈদগ্ধী মধ্যস্থতায় ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভূতিগম্য হয় ইহা

ন্যায়-প্রস্থান। ইহা সুপ্রাচীন কাল হইতে চলিতেছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর আর একটু অভিনব পথ আনিলেন, তাহার নাম রস-প্রস্থান।

তিনি রসস্বরূপ। তিনি রসিক। তিনি রসিকশেখর তাঁহার আস্বাদন রসের মাধ্যমে। নির্ম্মল প্রেম প্রীতি, হৃদয়ের শুদ্ধ সহজ ভালবাসা দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকে চিরতরে হৃদয়ের ধন আপনজন করিয়া লওয়া যায়। তিনি পরাৎপর পুরুষ, পুরুষোত্তম—কিন্তু আজ তিনি আমাদের ঘরের ঠাকুর নদীয়ার প্রাণ শ্রীগৌর হরি। শ্রীগৌরচন্দ্রিকা পদাবলীতে দৃষ্ট হয় গৌর হরি ব্রজের প্রত্যেকটি রসমাধুর্য্যই নবদ্বীপে আস্বাদন করিয়াছেন। এই আস্বাদন করিয়াছেন গৌড়মণ্ডলের অগণিত প্রিয়বর্গ সঙ্গে। প্রিয় পার্ষদগণ সঙ্গে যে সুনির্ম্মল বিলাসপুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন নবদ্বীপে, তাহা অনবদ্য অনুপম।

রসিকশেখরের অনুসন্ধান করিতে আর কালিন্দীতটে সমুদ্র নিকটে যাইতে হইবে না তিনি চিন্তামণি গৌড় মণ্ডলেই সুপ্রকট। তাঁহাকে পাইতে সবলেই সমান অধিকারী। উচ্চনীচ ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই রসিকশেখর গৌর মাধুর্য্য আস্বাদনে যোগ্য। তাহা আস্বাদন করিতে আর প্রকৃতি দেহ ভাবনা করিয়া গভীর রজনীতে নিভৃত কুঞ্জে যাইতে হইবে না। গৌড় মণ্ডলের গৌড়ের লীলা মধুরিমা, যাহার যে যথাবস্থিত দেহেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। ভাবাঢ্য গৌরসুন্দরকে সকল ভক্তগণই সেবা করেন নিজ নিজ ভাবানুসারে। "ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথসুতায়"—তাঁহাকে সতত আরাধনা করি নবদ্বীপধামেই॥ নদীয়া হইতে আর বাহির হইতে চাই না। নীলাচলের পথে নগ্নপদে আর ছুটিতে চাই না। ঝাড়িখণ্ডের পথে হিংস্র পশু পক্ষী সর্প সমভিব্যাহারে আর বনে অরণ্যে ছুটাছুটি করিতে চাই না, গৌড়মণ্ডলেই গৌড়ীয়ার প্রাণধনকে ধরিয়া রাখিব। শুদ্ধ ভালবাসার যে হাট পত্তন করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া ঋণী ভগবানকে আর কোথাও কেনা বেচা করিতে ছাড়িয়া দেব না। "কৃষ্ণকে বাহির না করিও ব্রজ হৈতে" এই বাণী আমরা শুনিয়াছি, এই বাণীর অনুকরণে, অনুসরণে, অনুধ্যানে আমরা রসিকশেখর গৌর সুন্দরকে গৌড় মণ্ডল হইতে বাহির করিব না।

সেই গৌর আমাদের দণ্ডকমণ্ডলুধারী নহেন, অরুণ বসন কৌপীনধারী নহেন, আমরা শ্রীলোচনদাসের লোচনে তাঁকে নিত্যকাল দেখিব—

ধবলপাটের জোড় পরেছে, রাঙা রাঙা পাড়দিয়েছে
চরণ উপর দুলিয়ে যাইছে কোঁচা॥

বাঁকমল সোনার নূপুর বাজাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা॥

মধুশীল অশ্রুজলে ভাসিয়া কাটোয়ায় তাঁর চাঁচর কেশ মুণ্ডন করে নাই—ঐ দেখা যায়, দেখ—

দীঘল দীঘল চাঁচর চুল তায়ে দিয়েছে চাঁপার ফুল
কুন্দ মালতীর মালা বেড়া ঝোঁটা।

চন্দন মাখা গোরা গায় বাহু দোলায়ে চলে যায়
ললাট উপর ভুবনমোহন ফোঁটা।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের হাতে গড়া "সারিকা" গুপ্ত রাধিকা শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের অশ্রুসিক্ত কীর্ত্তনের আখরের মাধুর্যমণ্ডিত ভাষায় বলিব—গৌর আমাদের নদীয়া বিনোদিয়া, শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া, কীর্ত্তন রসরসিক, রাসবিলাসের পরিণতি, রাইকানু একাকৃতি, প্রণয়-বিলাসাকৃতি, বিবর্ত্ত বিলাসমূর্ত্তি—নদীয়ার ঠাকুর গৌরাঙ্গ সুন্দর আমাদের, শচী মায়ের দুলালিয়া গদাধরের প্রাণ বধুয়া, নরহরির চিতচোরা, নিতাই চান্দের হৃৎকেতন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় প্রাণধন।

রসপ্রস্থানে কেন্দ্রগ পুরুষ রসশেখর শ্রী গৌরসুন্দর, তাঁর আদরের ধাম নিত্যধাম শ্রীনবদ্বীপ। সেখানেই যাব শ্রীবন্ধুসুন্দরের তীব্র লালসার মধুরপদ স্মরণ করিতে করিতে—

পড়িয়ে ডোর কৌপীন,হয়ে দীনের অধীন
কবে মুই যাব নদীয়ায়
সুরধুনী পারে রয়ে অষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে
ভাসিবারে নয়ন ধারায়
ধারায় সিক্ত হইয়া একটু মন্ত্রই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিব
শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র
হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র
হা শচীনন্দন চিত্তচোর
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥

রস-প্রস্থানের পরম লক্ষ্য ভূমি প্রিয়াজীর প্রাণেশ্বর ধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর !! ঐ ধামের ধূলিভিখারী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

জয় জগদ্বন্ধু হরি

আমাদিগের একবার সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইয়াছিল? অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

বিনয় ভূষণ সেনগুপ্ত

শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগতের সমক্ষে এক পরম শুভ এবং চরম মঙ্গলপ্রদ অবতার। শ্রীমন্মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই পরম তত্ত্ব (Supreme Reality)। "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। শ্রীমন্মহাপ্রভুই অপার্থিব শাশ্বত সুখ-শান্তির মূল উৎস।

ভগবান যুগে যুগে ভারতভূমিতে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধদেব প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি কিন্তু তদ্‌বিষয়ে চিরবঞ্চিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে এইবার বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইল। বাঙ্গালীকে ভগবান আপন করিয়া লইলেন।

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
তিনের চরণে বন্দো তিনে মোর নাথ॥"

[চৈ. চ. আ/১/১৯]

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি প্রভুগণ গৌড়দেশবাসীকে অর্থাৎ বাঙ্গালীকে আপন করিয়া লইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাঙ্গালীর ঘরে কেবল জন্মগ্রহণই করেন নাই, তিনি বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরসঞ্চিত মানসিক উপাদান প্রেম গ্রহণ করিয়া মূর্ত্তিমান প্রেম স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

"বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া।"

শাস্ত্রকারগণ ভগবদবতারের পূর্বে ভারতবর্ষের তথা জগতে ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, মেঘরাশি ভেদ করিয়া জ্যোৎস্না-প্রকাশী পূর্ণচন্দ্রোদয়ের মত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও এইরূপ ধর্মবিপ্লবের একটি পরিষ্কার চিত্র দেখা যায় একাদশ খৃষ্টাব্দে রচিত রামাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলের "নিরঞ্জনের উষ্মা।" নামক দশম পরিচ্ছেদের শেষে।

*   *   *   *

যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাত॥ ইত্যাদি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্ত্তী কালে রচিত বহু গ্রন্থে ও পূর্বাবস্থা বর্ণনে ধর্মের গ্লানির কথা যথেষ্ট শ্রুত হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে যথা—

নবদ্বীপে শঙ্খ ঘণ্টা শোনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নষ্ট করে॥ ইত্যাদি।

ঝড়ঝঞ্ঝাপূর্ণ দুর্যোগময়ী রজনীর অবসানে অরুণোজ্জ্বল জ্যোতিবিস্তার করতঃ তরুণ তপনোদয়ে যদ্রূপ জীবজগৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, সেইমত ধর্মবিপ্লবের মধ্যে অলোকসামান্য রূপলাবণ্য বিস্তারকারী প্রেমোজ্জ্বল বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে জগৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে (দোলের দিন) সন্ধ্যার পরে চন্দ্রগ্রহণের কিঞ্চিৎ পূর্বে চতুর্দিকে তুমুল হরিসংকীর্ত্তনের মধ্যে শুভক্ষণে শুভলগ্নে শ্রীশচীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভূতলে পদার্পণ করিলেন।

সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ
ষড়্ বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব সুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন।
এত বলি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ॥

[চৈ. চ. আ

পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট জিলার ঢাকা দক্ষিণ নামক গ্রামে উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতঃ বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত নবদ্বীপে আগমন করেন এবং ফরিদপুর নিবাসী, তৎকালে নবদ্বীপ বাসী জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীঠাকুরাণীকে বিবাহ করেন। জগন্নাথ মিশ্র বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পৌরোহিত্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। অবস্থা সচ্ছল থাকে নাই। হরিভক্তির গুণে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিতেন না। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥

নবদ্বীপ ধামের উত্তরাংশে বৈদিক ব্রাহ্মণ পাড়াতে গঙ্গার বায়ু কোণ। মাঠের সমীপে রাজপথের পার্শ্বে মাটির প্রাচীর ঘেরা সামান্য একটু আঙিনার মধ্যে মাত্র দুইখানি মাটির দেওয়ালযুক্ত খড়ের ঘর।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরের ঘটনা। শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবন যাইবার পূর্বে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে যাইতেছেন।

তবে শ্রীনিবাস চলি আইল নবদ্বীপ।
বারকোণা ঘাট প্রভুর বাটীর সমীপ॥
দেখহে প্রভুর ঘর তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি শ্রীনিবাস বড় হইল দুঃখিত॥

(ভক্তি রত্নাকর)

তৎকালে নবদ্বীপে কাহারও ইষ্টকালয় থাকে নাই (ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার)। জগন্নাথ মিশ্রের মাত্র দুইখানি খড়ের ঘর; বৈঠকখানা থাকে নাই। থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু অপরের অর্থাৎ হিরণ্য জগদীশের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিতেন না।

অনটন অবস্থাতেও জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় অতিথি এবং ছিলেন। গ্রন্থে আছে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী (বাঙালী) শচীমাতার হস্তে পাচিত মোচাঘণ্ট সেবন করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। জনৈক তৈর্থিক বিপ্র শ্রীপাদ কেশব ভারতীর আতিথ্য গ্রহণেরও বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টম গর্ভস্থ সন্তান; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের কথা শ্রুত হয়। অন্য কাহারও খবর পাওয়া যায় না। ধরিয়া লইতে হইবে তাঁহারা খুব অল্প বয়সেই পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যৌবন প্রবেশ মাত্রই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

একদিন নৈবেদ্যের তাম্বুল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া॥
আস্তে ব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিল পানি।
সুস্থ হৈঞা কহে প্রভু অপূর্ব কাহিনী॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈঞা গেলা।
'সন্ন্যাস করহ তুমি' আমারে কহিলা॥
আমি কহি আমার অনাথ পিতামাতা।
আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥
গৃহস্থ হইয়া করি পিতামাতার সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী নারায়ণ॥

[চৈ. চ. আ ২৫/১৬-২০

বুদ্ধিমান জগন্নাথ মিশ্রের বুঝিতে অসুবিধা হইল না যে এই ঘটনা কনিষ্ঠ পুত্রের ভাবী সন্ন্যাসের ইঙ্গিত বহন করিতেছে। তিনি এই ঘটনার কিছু পরেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাত আট বৎসর বয়ঃক্রমকালেই নিত্যধামে গমন করিলেন (মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন মানব জীবনের মতই সুখ-দুঃখময় নানা ঘটনা সমাকুল। ভক্তগণের নিকটে প্রসারিত তাঁহার দিব্য স্বরূপও যথেষ্টভাবে গ্রন্থকারগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাল্যকালে—

তৈর্থিক বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে রূপ দেখাইয়া করিলে নিস্তার॥

* * * *

এক হস্তেনবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা মানবোচিত বলিয়াই সর্বলোক হৃদয়গ্রাহ্য হইয়াছে। শ্রীভগবানের মানবরূপে লীলামাধুরির ধারায় এইপ্রকার।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রিড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০.৩৩.৩৫)

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"
(গোপালতাপনী শ্রুতি)

শ্রীমদ্ভাগবতে এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি ঃ—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণু কর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।
[চৈ.চ. ম, ২১/১০১

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায় তিনি প্রাকৃত মানবীয় লীলাই প্রকট করিয়াছেন। অবশ্য সময়ে সময়ে (গ্রন্থকারগণের মতে) কৃষ্ণস্বরূপে, বরাহস্বরূপে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ প্রভৃতি স্বরূপেও তিনি অতি মানবিক লীলা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মর্ত্যধামে বিদ্যমানকালে যাঁহারা তাঁহকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন (যেমন মুরারি গুপ্ত, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, কবি কর্ণপুর প্রভৃতি) তাঁহারা মাধুর্য্যের দিকটাই প্রকাশ করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যের দিক ক্বচিৎ ক্বচিৎ। যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করেন নাই, তাঁহাদের গ্রন্থে ঐশ্বর্য্য বর্ণনার ছড়াছড়ি। ইহা স্বাভাবিক। সাক্ষাৎ দর্শনকারীদের চিত্ত রূপগুণ মাধুর্য্যেই ভরপুর হইয়া থাকে; আর অসাক্ষাৎকারীদের চিত্তে মাহাত্ম্যাদি শ্রবণনিষ্ঠ তত্ত্ব জ্ঞানোদয় হেতু ঐশ্বর্য্যবোধই প্রবল হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্যকাল হইতেই নাম ছিল নিমাই। ভাল নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিশ্বরূপ। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া নবদ্বীপে তিনি নিমাই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অল্প বয়সেই তিনি চতুষ্পাঠী খুলিয়া ছাত্র পড়াইতে আরম্ভ করেন। খুব সম্ভব তিনি ব্যাকরণে ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। দর্শনাদি শাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এক বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতেন। পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীর পরাজয় বর্ণনা উপলক্ষে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার অমর কাব্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণনাতে এই সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট করিয়াছেন।

ব্যাকরণের মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিলু ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥
[চৈ. চ. আ ১৬.৩২]

"ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥"

ইত্যাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির প্রকাশ পায়। রথাগ্রে নৃত্যকালে বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণেও তাহা প্রমাণিত হয়।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদ-বেদান্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-ন্যায়-মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের প্রতিটি ২।৪ মাসের মধ্যে আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অল্প বয়সেই (অনুমান ১৭/১৮ বৎসর বয়সে) বল্লভাচার্য্যের কন্যা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে বিবাহ করেন। প্রভুর আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালে পণ্ডিতগণ দেশবিদেশে যাইলে জমিদার এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ বলেন, তিনি পিতামহীকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীহট্ট গিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরলোক গমন ঘটে। গ্রন্থকারের বর্ণনা ভঙ্গীতে

অনুমান করিতে অসুবিধা হয়না যে সর্পাঘাতে শ্রীমতীর দেহবসান ঘটিয়াছিল।

প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহসর্পবিষে তার পরলোক হৈল ॥
[চৈ. চ. আ ১৬/২১]

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভূত অর্থ ও বহু অনুগামী লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

ঘরে আইলা প্রভু বহু লৈঞা ধনজন।
তত্ত্ব কহি বৈল শচীর দুঃখ বিমোচন।
[চৈ. চ. আ ১৬/২৩]

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রায় ২০/২১ বৎসর বয়সের সময়ে সনাতন বিপ্রের কন্যা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে বিবাহ করতঃ গার্হস্থ্য জীবনে মনোনিবেশ করেন। কেশব কাশ্মীরী উদ্ধার প্রভৃতি লীলা এই সময়ে সংঘটিত হয়। পিতৃ পিণ্ডদানের জন্য গয়াধামে যাইয়া শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকটে দীক্ষালাভ করতঃ গৃহে আসিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া শিষ্যগণ সহ হাতে তালি দিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। প্রভুর আদি নাম সংকীর্ত্তন শ্রুত হয়।

হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে রাত্রিবেলা বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের সঙ্গে অতঃপর শ্রীখোল করতাল রীতিমত নানা প্রকার পদপদাবলীসহ শ্রীহরি কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাড়ে সাত প্রহরিয়া ভাব এবং আরও অনেক ঐশ্বরিক লীলা এই সময়ে প্রকাশ পায়।

নবদ্বীপে উদিত হইলেন প্রেমদাতা পতিত পাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু। নন্দন আচার্য্যের গৃহে তাঁহার সহিত শুভক্ষণে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মিলন হইল। ষড়ভুজ বিগ্রহ প্রভু এই সময়ে প্রকট করিলেন বলিয়া একাধিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভু রূপে-গুণে-চরিত্রে-ব্যবহারে লোকাতীত পুরুষ ছিলেন। গ্রন্থকারগণ একবাক্যে তাঁহাকে রোহিণীনন্দন শ্রীবলরাম বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভু অপেক্ষা দ্বাদশ বৎসরের বয়োধিক ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম ধৌত করিয়া সেই পবিত্র বারি ভক্তবৃন্দ সহ নিজে গ্রহণ করিলেন।

প্রভু বোলে শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ পাদোদক করহ গ্রহণ।
করিলে ইহার পাদোদক রস পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন ॥
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

পূর্বে কাজি দলন হইয়া গিয়াছে। স্মরণীয়কাল মধ্যে এই সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহ (আধুনিক নাম) আন্দোলন। এইবার জগাই-মাধাই উদ্ধার হইল—প্রেমদাতা পতিত পাবন প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের অপার কৃপায়। নিত্যানন্দ চলিলেন তাঁহার প্রেমদান লীলাতে গ্রাম গ্রামান্তরে।

সুরধুনী-তীরে আছে যত দেশ গ্রাম
সর্বত্র বিহরে মোর নিত্যানন্দ রাম ॥
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

এইসব ঘটনা ঘটে সন্ন্যাস গ্রহণের একবৎসর পূর্বে। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু হঠাৎ হঠাৎ লম্ফ, অশ্রুবর্ষণ, চীৎকার প্রভৃতি ভাব দ্বারা (লোকচক্ষে বাতব্যাধি দ্বারা) আক্রান্ত হইয়া প্রায় একবৎসরকাল চতুষ্পাঠী বন্ধ করিয়া গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। অনুমান করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে যিনি দুইবার বিবাহ করিয়া সংসারধর্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তিনি হঠাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর প্রেরণাতে এবং সাক্ষাতে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পতিতোদ্ধারণ লীলা এবং তাঁহার হরিনাম প্রেম প্রচারের (আচণ্ডালের ঘরে ঘরে) ধারা দেখিয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিতে জীব উদ্ধার-কল্পে আচণ্ডালের ঘরে ঘরে নাম প্রেম বিতরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। নিজ উন্নত-উজ্জ্বল ভক্তি সম্পদ বিতরণ তাঁর এক দৃঢ় সংকল্প। এই সংকল্প পূর্ণ করিতে সর্বজন গ্রাহ্য একমাত্র মাধ্যম সর্বজন-ধর্মনাম-সংকীর্ত্তন।

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥

এই কার্য্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ধারণাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার শ্রীমৎ প্রেমানন্দ দাস তাঁহার মনঃশিক্ষা নামক গ্রন্থে বলেন—

প্রেম বলিলাম অতি অদভুত
ভুবনে ফেলিল ঢালি
কাঙ্গালে পাইয়া খাইল লুটিয়া
বাজাইয়া করতালি॥

হাসিয়া কান্দিয়া ভূমে গড়াগড়ি
পুলকে ভরিল অঙ্গ।
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥

বর্ণাশ্রম ধর্মে বিপ্লব না ঘটাইয়া জাত্যভিমান দূর করত উচ্চবর্ণকে নীচ বর্ণের সহিত এক সমতলে আনিয়া কীর্ত্তনানন্দ উপভোগদান এবং মহোৎসবে নির্বিচারে, নির্দ্ধিধায় মহাপ্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুই করিয়াছেন। জাতি বর্ণের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিলে এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হইতে পারে না। সন্ন্যাস গ্রহণের সপক্ষে ইহাও বলবান কারণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রকারগণের মতে এবং ভক্তগণের বিশ্বাসানুযায়ী, স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন। রাধা প্রেমে তিনি ঋণী।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো বেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
(স্বরূপ গোস্বামী)

কৈছন রাধাপ্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তিঁহো ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে না ছিল পূরণ
কি করব না পাইয়ে ওর॥

ভাবিয়া দেখিল মনে রাধার স্বরূপ বিনে
এ প্রেম আস্বাদ কভু নয়।
রাধাভাব কান্তি ধরি রাধা প্রেমাগুরু করি
নবদ্বীপে হইল উদয়॥

এই অন্তরঙ্গ বাসনা পূর্ণ হইতে হইলে সব কিছু ন্যাস করা প্রয়োজন। এইজন্য প্রভুর সন্ন্যাসলীলা প্রকটন।

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যেই লীলা তাহা শেষ লীলা নাম॥
[চৈ. চ. ম. ৩/৩]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ১৪৩১ শকে ২৯শে মাঘ। তিরোভাব ১৪৫৫ শকে ৩১শে আষাঢ়। সন্ন্যাস জীবন ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন। (ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসজীবন দিব্যভাবময়, যাহা অন্তিমে চিত্ত-চমৎকারী প্রৌঢ়ানন্দময় ভাবান্তিমদশা মহাভাবোন্মাদ দশায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

তিনি তাঁহার ধর্মমত প্রচারের জন্য উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহে প্রথমে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচারের ভার অর্পিত হইল শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে।

নিত্যানন্দ প্রভু হস্তে সমর্পিবা ক্ষিতি।
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি॥

শ্রীরূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামিপ্রভুগণের উপরে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং গ্রন্থাদি প্রণয়নের ভার অর্পিত হইল। প্রথমার্দ্ধ ধর্মের গ্লানি বিদূরণার্থে পরম ধর্মের (ভাগবত ধর্মের) সংগঠনে, নিজ আচরণ দ্বারা প্রচার এবং অপরার্দ্ধ মহাভাব ভাবিত হৃদয়ে রাধামাধবের মধুর প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদনে ব্যয়িত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস জীবনের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ব্যপদেশে, পরবর্ত্তী ছয় বৎসর নীলাচলে ভক্তগণ সঙ্গে কীর্তনানন্দে এবং শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাভাবমাধুর্য্যাস্বাদনে ব্যয়িত করেন।

শেষ যে রহিল প্রভু দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥

শ্রীরাধার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই মত ভাব প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥

রাত্রি দিন স্ফুরে কৃষ্ণের বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সব প্রলাপময় বাদ॥

রোমকূপে রক্তোচ্ছ্বাস দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥

গম্ভীরার মধ্যে রাত্রে নাহি নিদ্রাসব।
ভিত্তে মুখ ঘর্ষেণ ক্ষত হয় সব॥

তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহ দ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥

চটক পর্বত হেরি গোবর্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥

(শ্রীচরিতামৃত)

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীরূপ, রঘুনাথ প্রভৃতি গোস্বামিগণের রচিত "অষ্টকাদি শ্লোক" হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যভাবোন্মাদের বর্ণনা নিজগ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ ভাগবত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের প্রতি অন্তর্নিহিত প্রেম (Immanent Love) ক্রমশ অনুশীলনবশতঃ ভগবৎ প্রেমে (Transcendent Love) পরিণত হয়। শ্রীমদ্ ভাগবত দর্শনের ইহাই সারকথা। শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনরূপ সার্বজনীন ধর্ম (Mass Religion) প্রচার করিয়া মানবের চিত্তে ভগবদভক্তির উন্মেষে সাহায্য করিয়াছেন। ভাগ্যবান মানব তদাশ্রয়ে ভগবৎ প্রেম (Love Divine) লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেমের মাল্য গাঁথি পরাইল সংসারে॥

অতএব, শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্ম দ্বিমুখী বলা যায়, এক জীবজগতাভিমুখী অপর ঈশ্বরাভিমুখী। জীবদরদী মহাপুরুষ শ্রীবুদ্ধদেব মানবের নৈতিক মান উন্নত করিয়া জীবনকে সুখশান্তিময় করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মানবের আত্মিক মান উনত করিয়া ভগবৎ প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া জীবনকে মাধুর্য্যময় সুষমাবিমণ্ডিত করিবার পন্থা দেখাইয়াছেন।

শ্রীবুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়েন ৫৫৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবির্ভূত হন ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে। এই সুদীর্ঘ দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে এমন মানবদরদী বিশ্বপ্রেমিক লোকোত্তর পুরুষ আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই।

শ্রুতিবাক্যে বলা হয়েছে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি, শ্রীমদ্ভাগবতে 'বিনাচ্যুতাদ্ বস্তুতরাং ন বাচ্যং' "যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ" সর্বভূতকে সর্ববস্তুকে অনন্য হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরবুদ্ধিতে প্রণাম করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী

উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবেন নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে বলি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। [শ্রীচরিতামৃত]

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
ইহা বই ধর্ম নাই শুন সনাতন॥ [প্রবাদ বাক্য]

তিনি সর্বরূপে নিজরূপ মিশাইয়া রাখিয়াছেন, জগতের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সবকিছুতেই তিনি বিদ্যমান। নিরাকার হইয়াও সাকার, আবার সাকার হইয়াও নিরাকার।

সর্বরূপে নিজরূপ মিশাইয়া রসভূপ
রূপ তুমি ধর নিরাকার।
কহ খি বিশ্বমাঝে তোমা বই কার আছে
অপরূপ রূপের বাহার॥ (ভক্তের উক্তি)

জগতজীবের মধ্যে জগদীশের দর্শন করিতে হইলে সাধনের অপেক্ষা করে। অন্ধ ব্যক্তি ছবি দেখিতে পায় না।

সর্বত্র কৃষ্ণের রূপ করে ঝলমল।
সেই হেরে নেত্র যার হৈঞাছে নির্মল॥
অন্ধীভূত হেরে নেত্র যার বিষয় ধূলিতে।
কেমনে সে দিব্যরূপ পাইবে দেখিতে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই অভিমত। তাঁহার কথিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ ভালভাবে বুঝিতে হইলে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত বেদান্ত দর্শনের শ্রীগোবিন্দভাষ্য নামক টীকা দ্রষ্টব্য।

যাহা দ্বারা অর্থাৎ যেই মন দ্বারা পরম সত্যকে দেখা যায় (অনুভব করা যায়) তাহাই দর্শন। আধ্যাত্মিকবাদই দর্শন। হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত দর্শনে দর্শন অভিব্যক্ত সাহিত্যে, শিল্প প্রভৃতি কারুকর্মে।

ভারতবর্ষ নানাপ্রকার দর্শনের উৎপত্তি স্থান। এবং নানাপ্রকার দর্শনের বিলাসভূমিও।

১। নাস্তিক দর্শন ঃ—লোকায়ত দর্শন বা চার্ব্বাক দর্শন। লোকে (লোকসমাজে) আয়ত (বিস্তৃত) লোকায়ত বা (চারু+বাক) চার্ব্বাক দর্শন (-যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ) চিরকাল মানব-সমাজে বিদ্যমান আছে।

২। বৌদ্ধ দর্শন ঃ—নাস্তিক্য দর্শনের প্রতিবাদে উদ্ভব। দৈহিক ভোগই সবকিছু নহে। জন্মান্তর ও পঞ্চস্কন্ধও আছে। শূন্যই তত্ত্ব—এক, অদ্বয়, পরমানন্দ। এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব বলিয়াছেন "শূন্যং শূন্যং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং।" সমস্তই শূন্যই, সমস্তই স্বলক্ষণ (নিজেই নিজের লক্ষণ) সমস্তই ক্ষণিকং, সমস্তই দুঃখময়। বুদ্ধদেবের বিচিত্র ভাবময় এই উপদেশ চতুষ্টয়ই বৌদ্ধগণকে যথাক্রমে মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক, এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে।

৩। জৈন দর্শন ঃ—বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদের প্রতি-বাদে ভগবান শ্রীমহাবীর জৈন প্রচার করিলেন"—শূন্য কখনও তত্ত্ব হইতে পারে না, সবকিছুই যদি শূন্য হইল তবে দুঃখ ভোগ করে কে? এবং দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াসই বা কেন? পরিদৃশ্যমান জগতের শূন্যতা স্বীকার করিলে জগতের প্রতি অনাশ্বাস ঘটিয়া যাইবে। আত্মার স্থায়ী অস্তিত্বই যদি না থাকে তাহা হইলে বুদ্ধের দেওয়া শূন্যবাদে মনঃসংযোগ করিবে কে?"

৪। সাংখ্য দর্শন ঃ—শ্রীমহাবীর জৈনের মুখে চেতনাত্মার সাবয়বত্বের কথা এবং অলোক আকাশে অবিরাম ভ্রমণাত্মক মুক্তির কথা শুনিয়া প্রাচীন ঋষি কপিলের মুখে উপহাসের হাসি দেখা দিল। "ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" আত্মা অধিকার ও নিরবয়ব। আত্মা কারণও নয়, কার্য্যও নয়। জীবাত্মা বহু সুখ দুঃখ প্রকৃতিগত, প্রকৃতি হইতে উত্তরণই মুক্তি। "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা, তদভিঘাতকে হেতৌ" ইত্যাদি। এই সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না,—"ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ প্রামাণাভাবাৎ"। মহাভারতে বনপর্ব্বে কথিত অগ্নিবংশজ কপিল নামক জনৈক ঋষি এই নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রবর্ত্তক। কর্দ্দমপত্নী দেবহূতির গর্ভজাত কপিলদেব সাংখ্যদর্শন প্রবর্ত্তন করেন। ইনি ভগবানের অবতার। ঈশ্বর সর্ব্বস্বীকৃত এবং ভক্তিযোগই তাঁহার লাভোপায়।

৫। যোগদর্শন ঃ—যোগদর্শন কপিলের সমস্ত তত্ত্বই স্বীকার করিয়া লইয়া তদুপরি ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বরূপে পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরের উপদেশ করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি ঈশ্বর চিন্তারই প্রাধান্য দিয়াছেন। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা"।

৬। ন্যায় দর্শন ঃ—মহর্ষি গৌতম প্রণীত

শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা জীবের পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত দুঃখের ও মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটিয়া জীব চিরমোক্ষাবস্থা লাভ করেন।

৭। জৈমিনি দর্শন ঃ—মীমাংসা দর্শন প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি কষ্ট-পারম্যবাদী। জৈমিনীর কতকগুলি যুক্তি অকাট্য। মুক্তিতে যদি সুখদুঃখাদি কোনই অনুভূতি না থাকে তবে ইটপাথরের সঙ্গে মুক্ত জীবাত্মার পার্থক্য কোথায়? ইত্যাদি। সুখই জীবের কাম্য এবং কর্ম দ্বারাই চরম সুখ প্রাপ্তি হইতে পারে।

৮। বেদান্ত দর্শন ঃ—ভগবান কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস উপনিষদ সমূহের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রদান করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্র নামক বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করেন। পরবর্তীমনীষিগণ উক্ত বেদান্তদর্শন ব্রহ্মসূত্রের দ্বিবিধ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। একটি ভাষ্য নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মসত্তার দিকে, অন্যটি সবিশেষ সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপক ভগবৎ তত্ত্বের দিকে। প্রথমটি কেবল অদ্বৈতবাদিগণের মতে আর দ্বিতীয়টি ভক্ত বৈদান্তিকগণের মতে। আচার্য্য শঙ্কর প্রথম মতের সমর্থক ও প্রচারক। আর আচার্য্য রামানুজ, মাধবাচার্য্য, শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রভৃতি সকলেই শেষোক্ত মতের সমর্থক ও প্রচারক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে যিনি ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন তাঁহারই রচিত গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত সূত্রের প্রকৃত ভাষ্য (অর্থ) ঃ—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ"
ইত্যাদি

গরুড় পুরাণোক্ত শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে "সত্যং পরং ধীমহি"—বন্দনাশ্লোকস্থ এই বচনে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশেষ শ্লোকে ঃ—

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

যাঁহার নাম সংকীর্ত্তন সর্ব্বপাপ প্রণাশক এবং যাঁহার চরণে প্রণাম দুঃখ (ত্রয়ের) প্রশমক পরমেশ্বর সেই শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে প্রেমই পরম পুরুষার্থ। (প্রেমা সুখর্থো মহান্)। মুক্তি পরমার্থ নহে। হরিপাদপদ্ম লাভ করিলে মুক্তি (দুঃখের চরম নিবৃত্তি) হয় না। প্রেমভক্তি অর্থাৎ ভালবাসা দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং তাহাই মুক্তির অতীত অবস্থা অমৃত স্বরূপ।

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে" ঈশ্বরাভিমুখী প্রেম মানব জীবনের চরম সার্থকতা প্রদান করে। ইহা লাভ-লোকসানবোধের অতীত এক তুরীয় মহিমায় মহিমান্বিত।

এই ভগবৎ প্রেমের একটী স্বারসিকবৃত্তি আছে। অপকৃষ্ট উদাহরণ হইলেও যেমতি বলা যায়, গঞ্জিকাসেবী যেমন নিজের মৌতাতেই বুঁদ হইয়া থাকে, অন্যের নিন্দাস্তুতিতে অবিকৃত চিত্ত হইয়া থাকে, সেইমত এই প্রেম যাঁহার চিত্তে সঞ্চিত হয়, তিনি ঐ প্রেমের স্বভাবগত মাধুর্যেই আত্মহারা হইয়া থাকেন।

"যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তাহাতে এতেক লক্ষণ সর্ব্বশাস্ত্র কয়॥
(শ্রীচরিতামৃত)

শ্রীপাদ রূপগোস্বামিকৃত-বিদগ্ধমাধবের শ্লোকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে যাঁহার চিত্তে প্রেমভক্তির সঞ্চার হইয়াছে সেই ভগবৎপ্রেমিক ব্যক্তি নিজ স্তুতি শুনিয়া ব্যথিত হন এবং স্তুতিকারীকে আপনজন জ্ঞান করেন না। নিন্দুককে (যেন পরিহাস করিতেছে ভাবিয়া) প্রিয়জন মনে করেন। দোষ-দর্শনে প্রেমার ক্ষয় হয় না, গুণ বর্ণনেও বৃদ্ধি হয় না। ভগবৎ প্রেমার ইহাই হইল কোন স্বারসিক স্বভাবের বিকাশশীল প্রক্রিয়া। "এই অহৈতুকী প্রীতির বিবর্ত্তই হইল বাঙ্গালীর প্রেমধর্ম। ইহাই হইল বাঙ্গালীর প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কলিতে জীবের উদ্ধারের জন্য অসাধারণ দান।" (মঃ মঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

মিঃ গ্রাউসী নামক জনৈক বিদেশী মনীষী তাঁহার "The Mathura" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Reality, the Perenuial Source of Eternal Bliss & Happiness, as regarded by the

Vaishnavas, overflooded whole India with his unparallel streams of love and bliss."

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য, তাহার ধাম বৃন্দাবন। ব্রজবধূগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন রম্যবিধি তাঁহার উপাসনা ভাগবৎ শাস্ত্রই অমল প্রমাণ। প্রেমই পরম পুরুষার্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মতের প্রতি আমাদের পরম আদর।

যিনি দয়াময়, প্রেমময়, দীনবন্ধু, অনাথনাথ—শাস্ত্রে যাঁকে করুণাসিন্ধু বলিয়া নির্দেশ করে, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে জীবের এত কঠোরতা, এত জটাভার বহন, এত অনিদ্রা অনশন ভোগ করিতে হয়! কলির জীবের জন্য কি আর কোন সহজ-সরল পথ নাই? কেন থাকিবে না? মহাপ্রভু তো বলিয়া গিয়াছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীমদ্ অন্নদাঠাকুর।

পরম ভাগবত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি

(ভাগবত টীকাকার)

সংক্ষিপ্ত জীবনী—লেখক—**রবিন রাহা**

ভাগবতের টীকাকার রূপে আমরা প্রধানতঃ দুই মহাপুরুষের নামই জানি যাঁহারা হইতেছেন শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীধরস্বামীর আবির্ভাব শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আনুমানিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে এবং তাঁহার ভক্তিময় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অধম লেখকের প্রণীত "বৈষ্ণব জগতের মাধুকরী" দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাপ্ত হইবেন, সেজন্য এখানে বিস্তারিত প্রসঙ্গ করিব না। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বলিয়া আমাদের মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামি-রচিত ভাগবতের টীকা অনুশীলন করিতে পারিয়াছিলেন এবং চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার পরবর্ত্তী কালের বলিয়া তাহা আস্বাদন করিবার সুযোগ মহাপ্রভুর হয় নাই এবং আমার মনে হয় মহাপ্রভু যদি এই চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা আস্বাদন করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনিও ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন যেমনটি তিনি করিয়াছিলেন শ্রীধরস্বামীর ক্ষেত্রে যথা—

প্রভু হাসি' কহে,—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥

চৈ. চ. অ ৭।১১১

শ্রীধর স্বামী-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধর-স্বামী 'গুরু' করি মানি ॥
শ্রীধর-উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
'অর্থব্যস্ত' লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥
শ্রীধরের আনুগত্যে যে করে লিখন।
সব লোকে মান্য করি করিবে গ্রহণ ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত আখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥

চৈ. চ. আ ৭।১২৯—১৩২

শ্রীধরের জন্ম যেরূপ সুদূর মহারাষ্ট্রে আমাদের এই [illegible]পাদ কিন্তু জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গদেশের অন্তর্গত নদীয়া জেলার দেবগ্রামে ১৫৮৬ শকে অর্থাৎ ইংরাজী ১৬৬৫ সালে। তাঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন যথা জ্যেষ্ঠ রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ এবং কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় ১৭৯ বৎসর পরে এই প্রসিদ্ধ টীকাকারের জন্ম। কথিত আছে যে এই কনিষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র এক অলৌকিক স্বর্গীয় জ্যোতিতে সূতিকাগার আলোকিত হইয়াছিল। অর্থাৎ ভগবৎ কৃপায় জন্মলগ্ন হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ক্রমে এই মহাপুরুষ মুর্শিদাবাদ জেলার সৈদাবাদ নিবাসী শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং এই জন্যই বোধহয় তিনি নিজেকে সৈদাবাদ বাসী বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যাহা এই নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হইবে বা যাহাকে গুরু আনুগত্যও বলা যাইতে পারে কারণ বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে দীক্ষার মাধ্যমে শিষ্যের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হয় সেহেতু তিনি বোধহয় সৈদাবাদকেই প্রকৃত জন্মস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ঃ—

"সৈদাবাদ-নিবাসি-শ্রীবিশ্বনাথাখ্য-শর্ম্মণা।
চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী ॥"

যাহার বাংলা ভাবার্থ হইতেছে যে পরবর্ত্তী কালে "সুবোধিনী" নামক "অলঙ্কারকৌস্তুভে"র যে টীকা তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহার পরিশেষে তিনি নিজেকে সৈদাবাদ নিবাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীধর স্বামীও "সুবোধিনী" নামক এক টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিভিন্ন শাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে তিনি তর্কবিচারে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বাল্যকালেই পরাস্ত করিয়া

ছিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক চরিত্র ছিল ভাবুক প্রকৃতির। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন এবং পিতা মাতা তাঁহার এই ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন যেমনটি দেখা যায় দাস গোস্বামীর জীবনে এবং ব্রজের সিদ্ধ মহাত্মা সূর্য্যকুণ্ডের মধুসূদন দাস বাবাজীর জীবনে। অর্থাৎ সেই সুকৃতি যাঁহাদের থাকে তাঁহাদের কোন প্রকারেই এইসব মায়িক বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যায় না। পুত্রের ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া পিতা তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত পড়াইয়াছিলেন এবং ভাগবত পাঠের প্রভাবে তাঁহার এই বৈরাগ্য দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তিনি স্নেহময়ী জননী, পুত্র বৎসল পিতা, রূপবতী ভার্য্যা এবং অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলিয়া যান। যে কথা দাসগোস্বামীর পিতা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

"দড়ির বন্ধনে তারে রাখিব কেমনে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে"॥

এক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। বৃন্দাবন বাসী হইবার পর একবার মাত্র তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে শ্রীধামে চিরস্থায়ী হন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে তিনি বাস করিতেন রাধাকুণ্ড তটে পরম ভাগবত কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিত্যক্ত কুটিরে এবং তাঁহার সাথী ছিলেন কবিরাজ গোস্বামীর সুযোগ্য শিষ্য এবং পরম বৈষ্ণব শ্রীমুকুন্দদাস। এই কুণ্ড তটে অবস্থান করিয়াই তিনি ভাগবতের টীকা ব্যতীত আরও ২৩ (তেইশ) খানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন যাঁহার সব নাম প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং যদি কোন সহৃদয় জ্ঞানী পাঠক ইহার সন্ধান দিতে পারেন তাহা হইলে অধম লেখক কৃতার্থ হইবে। তন্মধ্যে ষোলখানি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গের পরিশেষে প্রদত্ত হইবে। কথিত আছে যে "চৈতন্যরসায়ন" নামক আরও একখানি গ্রন্থ তিনি লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু স্বপ্নযোগে চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে নিষেধ করাতে তিনি তাহা হইতে বিরত হন।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গ্রন্থাদি রচনার পর জীবনের শেষভাগে "গোকুলানন্দ" বিগ্রহের সেবা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে দাস গোস্বামীর গোবর্দ্ধন শিলা আনিয়া সেবা পূজাও করিতেন। এই গোবর্দ্ধন শিলার সামান্য ইতিহাস আছেন যাহা এইরূপ। এই শিলা সর্ব্বপ্রথম শংকরানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুকে পুরীতে প্রদান করেন। পরে দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হন। দাস গোস্বামী এই গোবর্দ্ধন শিলাসহ রাধাকুণ্ডে স্থায়ী হন এবং তাঁহার অপ্রকটের পর পরম ভাগবত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সেবাপূজা করিতেন এবং তাঁহার অপ্রকটের পর তদীয় শিষ্য শ্রীমুকুন্দদাস রাধাকুণ্ডেই সেই সেবা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুরের আশ্রিত শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যখন কুণ্ডতটে বসিয়া সাধন ভজন করিতেন তখন মুকুন্দদাস কৃপাপরবশ হইয়া এই অমূল্য শিলা তাঁহাকে অর্পণ করেন এবং তিনিই মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে সেবার জন্য দিতেন। বর্ত্তমানে এই অমূল্য গোবর্দ্ধন শিলা শ্রীধাম বৃন্দাবনের "গোকুলানন্দ" বিগ্রহ মন্দিরে আছেন।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অনেক শিষ্য ছিলেন এবং তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের নিকটবর্ত্তী রেঞাপুর নিবাসী বিপ্র জগন্নাথ একজন। তাঁহার বংশগত নামচক্রবর্ত্তী হইলেও সাদিপুর নিবাসী শ্রীরাসবিহারী দাস সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বলেন যে এই "চক্রবর্ত্তী" উপাধিটি তাঁহার ভক্তগণ প্রদত্ত। ময়মনসিংহ জেলার ভাঙ্গাগ্রাম নিবাসী শ্রীউমাকান্ত চৌধুরীর "স্বপ্নবিলাসামৃত" গ্রন্থের ভূমিকাতেও এইরূপ দৃষ্ট হয় যেখানে তিনি লিখিয়াছেন—

বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তি-বর্ত্ম-প্রদর্শনাৎ ॥
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাচ্চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ ॥

ইহার বাংলা ভাবার্থ এইরূপ—অর্থাৎ শ্রীপাদ সকলকে ভক্তিপথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বনাথ এবং ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত বলিয়া চক্রবর্ত্তী।

কথিত আছে যে বৃন্দাবন থাকাকালে তিনি জয়পুরের রাজসভায় চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা করেন

এতদ্‌ব্যতীত চক্রবর্ত্তিপাদ কাব্যশাস্ত্রে সুদক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যগ্রন্থ অনুশীলন করিলে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের আভাস পাওয়া যায়। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিলেও একমাত্র সুবৃহৎ শ্রীমদ্‌ ভাগবতের টীকা লিখিয়াই বৈষ্ণব জগতে চিরস্মরণীয় এবং চিরভাস্বর হইয়া আছেন। তাঁহার প্রণীত "ভাবনামৃত" নামক মহাকাব্যখানি বিবিধ রস, ভাব, অলঙ্কার ও প্রসাদাদি গুণ পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার লেখনীর এমনই মাধুর্য্য, যে কোন গ্রন্থ যখনই পাঠ করা হউক না কেন তাহাতে পাঠককে মুগ্ধ হইতেই হইবে। কথিত আছে যে তিনি স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর ছদ্মনামে অনেক কবিতা রচনা করিয়া স্বীয় গুরুদেবের মহিমা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা গুরুভক্তির এক নব প্রকাশ।

তাঁহার রচিত ২৩ খানি গ্রন্থের মধ্যে যে ষোলখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তাহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল যথা—

১। সারার্থ দর্শিনী—নামক ভাগবতের সম্পূর্ণ টীকা।

২। সারার্থ বর্ষিণী—নামক গীতার সম্পূর্ণ টীকা।

৩। সুবোধিনী—নামক অলঙ্কারকৌস্তুভের টীকা।

৪। সুখবর্ত্তিনী—নামক আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পুর টীকা।

৫। বিদগ্ধমাধবের—টীকা।

৬। ভাবনামৃত—নামক চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনাত্মক মহাকাব্য।

৭। স্বপ্নবিলাসামৃত—নামক কাব্য।

৮। মাধুর্য্যকাদম্বিনী—নামক ভক্তিগ্রন্থ।

৯। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী—নামক কাব্যগ্রন্থ।

১০। স্তবামৃতলহরী—নামক স্তবমালা।

১১। চমৎকারচন্দ্রিকা—নামক ভক্তিগ্রন্থ।

১২। গৌরাঙ্গলীলামৃত—নামক পয়ার গ্রন্থ।

১৩। চৈতন্যচরিতামৃতের—সংস্কৃত টীকা।

১৪। উজ্জ্বলনীলমণির—আনন্দচন্দ্রিকা নামক টীকা।

১৫। গোপালতাপনীর—ভক্তিময় টীকা।

১৬। গৌরগণচন্দ্রিকা—নামক টীকাগ্রন্থ।

১৭। এতদ্ব্যতীত "চৈতন্যরসায়ন" নামক আরও একখানি গ্রন্থ তিনি লিখিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন কিন্তু মহাপ্রভু স্বপ্নের মাধ্যমে নিষেধ করায় তিনি তাহা হইতে বিরত হন।

এতদ্ব্যতীত আরও এই জাতীয় সাতখানি ভক্তিগ্রন্থ তিনি সংস্কৃতে রচনা করিয়াছিলেন যাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। ভাবিলে অবাক লাগে যে তৎকালীন পরিবেশে কিরূপে একজনের দ্বারা এইরূপ অসাধ্যসাধন হইতে পারে। কিন্তু কৃপায় সবই সম্ভব। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও মদনমোহনের কৃপাশক্তিতে বলীয়ান্‌ হইয়া বৃদ্ধ জরাতুর অবস্থায় এই চরিতামৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীও যে কিভাবে নৃসিংহদেবের কৃপায় ভাগবতের টীকা সংকলন করিয়াছিলেন তাহাও এক অপূর্ব্ব কাহিনী। অর্থাৎ সেই মাধবের কৃপায়—"মূকং করোতি বাচালং" তাই সবই সম্ভব।

ইঁহারা সব চিহ্নিত পুরুষ এবং জীবের মঙ্গলার্থে তাঁহাদের লীলাদেহের মাধ্যমে পরমার্থ দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের উত্তর-সুরিগণ তাহা যুগ যুগ ধরিয়া আস্বাদন করেন। বর্ত্তমানকালে ভাগবত পাঠকগণ এইসব টীকার আশ্রয়ে নানাবিধ মনোরম ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতাগণকে উল্লাস দান করেন কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের অনুভূতির মাধ্যমে এইসব নির্য্যাস বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের মহাজীবন সম্বন্ধে আমাদের সকলের অল্পবিস্তর জানা উচিৎ। অন্ততঃ ভাগবত পাঠ শ্রবণেচ্ছু ভক্তগণের পক্ষে শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জীবন আলেখ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিদধিক জ্ঞান থাকা দরকার।

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গমহাপ্রভু যাঁদের প্রাণ সেই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধারম্ভে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য্যের নিম্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং তাঁহার নিজপ্রণীত "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত" গ্রন্থের প্রারম্ভে যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা যথাক্রমে—

নিত্যানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রাহ-
দ্বৈতঃ পৃথ্ব্যামেধয়ন্ প্রেমসিন্ধুম্ ।
সন্তপ্তং বৈ স্তেময়ংশ্চেতয়ন্মাং
ধিন্বন্ ভূয়াৎ স্বৈঃ কৃপারাশিলেশৈঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঘনং প্রপদ্যে
সপদ্যপধ্বস্ততমঃপ্রপঞ্চম্ ।
পঞ্চেষু-কোট্যর্ব্বুদকান্তিধারা-
পরম্পরাপ্যায়িত-সর্ব্ববিশ্বম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্

পাঠবাড়ীর এই সঙ্কলনের মধ্যে এই জীবন চরিত দেওয়া হইল। অধমের নিজস্ব কোন অবদান নাই, সবই বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহ; সেজন্য দোষত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করিবেন এবং দোষদর্শাইলে বাধিত হইব।

কলিযুগে মহাজন গৌরাঙ্গ আমার।
নাম দিয়া উদ্ধারিলা জগৎ সংসার ॥
নাম সঙ্কীর্তন পথ ধর দৃঢ় করে।
ভাবিতে হবে না কিছু যাবে তুমি তরে ॥

—ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

মধুরের সওদাগর

"আশিস কমল সরকার"

সওদাগর ঘুরে বেড়ান দেশে দেশান্তরে। এক প্রান্তের আহরিত সম্পদ-সম্ভার তিনি ছড়িয়ে দেন অন্য প্রান্তে। দেয়া-নেয়ার এই যে নিরন্তর কর্মকাণ্ড একেই আমরা বলি সওদাগরী। বস্তুজগতে এ সওদাগরী হ'ল বাণিজ্য, আর হৃদয়ের দুনিয়ায় ধর্ম। বাণিজ্যের সওদাগর হাতে-হাতে বস্তুর বিনিময় করেন অর্থের তাড়নায়, আর অমৃতের সওদাগর প্রাণে-প্রাণে প্রেমের বিনিময় ঘটান পরমার্থিক বাসনায়। বিকি-কিনির হাটে হাটে দেখা মেলে কত না সওদাগরের। কালের জোয়ারে তাঁরা আসেন আবার ভাঁটার টানে তাঁরা মিলিয়ে যান বিস্মৃতির অতল সাগরে। অমৃতের সওদাগরের আবির্ভাব বিশ্বের বিরল ঘটনা। তবে যাঁরা সেই অমৃতের ভগীরথ তাঁরা চিরন্তন হয়ে থাকেন বিশ্বমানবতার মর্মপথে।

আর্তের ত্রাণকল্পে যুগে যুগে ঈশ্বর নেমে আসেন এ পৃথিবীর বুকে অবতার রূপে। সেই অবতাররূপী ঈশ্বর পরম শক্তি আর ঐশ্বর্য্যের প্রতিভূ। তাঁর আত্মপ্রকাশ জীব মানসে জাগিয়ে তোলে ভয়, সম্ভ্রম-সংকোচ মিশ্রিত শ্রদ্ধা। সেখানে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সাথে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেন না। প্রিয় হয়ে উঠতে পারে না প্রিয়তম। তাই বিশ্বরূপ দর্শনের পর প্রাণসখা কৃষ্ণের কাছেও অর্জুন হয়ে ওঠে ক্ষমাপ্রার্থী।

'হে পরম পুরুষ, না জেনে তোমাকে আমি অতি স্নেহের বশে হে কৃষ্ণ, হে যাদব বলে ডেকেছি, আর আহারে, বিহারে, আসনে, শয্যায়, প্রকাশ্যে গোপনে তোমাকে যা কিছু বলেছি তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা কর।'

ঐশ্বর্য্যের এই ভগবান স্বর্গে নির্বাসিত দেবতা। করুণার মাধুর্য্যে সে ঈশ্বরই আবার হয়ে ওঠেন এ ধুলো-মাটির পরম আপন জন। যাঁর কাছে কাঁদতে পারে মানুষ, যাঁর বুকে-বুক রেখে প্রাণ খুলে বলতে পারে সব সুখ-দুঃখের কথা, সেইতো পরমাত্মীয়। স্বর্গের ঐশ্বর্য্যময় দেবতা নয়, মর্তের পরমাত্মীয় সেই অমৃতের সওদাগরই শুধু সাধন করতে পারে মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ।

যুগে যুগে অবতীর্ণ অবতারের মাঝে দেবভূমি এ ভারতে সেই অমৃতের পুত্র একবার আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে। পাণ্ডিত্যের প্রগল্‌ভতায় আবিষ্ট, কুসংস্কারের পাকদণ্ডীতে আবদ্ধ, বিষয়ীর বিষয় চিন্তায় জর্জরিত এই ভারতের এক মহাসংকট কালে শচীমাতার কোল আলো করে, পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের কুলউজ্জ্বল করে। মহা সাধক অদ্বৈতের বাসনা পূর্ণ করে সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষার রূপ ধরে, সুরধুনী জাহ্নবীতীরে বাংলার শ্যামল প্রান্তরে— মহাতীর্থ নবদ্বীপ ধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন নিমাইচাঁদ। তারপর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর নানা লীলা খেলা শেষ তবু তিনি আজও বিদ্যমান ভক্তজনের প্রাণে প্রাণে। তিনি এসেছিলেন পরমেশ্বরের রূপ ধরে নয়, মধুরের সওদাগর হয়ে। তাই বিশ্বমানব আজও গেয়ে ওঠে,—

—তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু,
তুমি মধুর সায়র, মধুর নির্ঝর
আমার পরাণ বঁধু।

এমন সর্বজন পরাণ বঁধু তিনিই হতে পারেন যাঁর প্রেম স্ব-সুখ বাসনা শূন্য, যিনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন ভক্তের কোন জাত নেই, যিনি সব অস্পৃশ্যতা ভাসিয়ে দিতে পারেন নির্মল প্রেমের বন্যায়, ভাসিয়ে দিতে পারেন সব সামাজিক লৌকিক বাধা নিষেধ। এ অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন শচীদুলাল তাঁর অপার ভক্তির অরূপ ধারায়; কবিদার্শনিক রবীন্দ্রনাথের কথায়—

…'যে ভক্তি অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর—সর্ব কর্মে দিবে বল,

ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব প্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন॥'···

অমর্ত্য-গম্ভীর পরিপূর্ণ চিত্তে এ দাহহীন দীপ্তি-মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হ'ল সেই ভক্তি। ভক্তিই আনন্দের উৎস, বাসনার তৃপ্তি, দুঃখের পরিসমাপ্তি।

কিন্তু কার প্রতি ভক্তি? মাটির পুতুলের না স্বর্গ-নির্বাসিত ঈশ্বরের? এ কঠিন প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর দিয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। ভক্তি মানুষের প্রতি, তার অন্তরাত্মার প্রতি। তাই আচার্য্য অদ্বৈত আর যবন হরিদাস তাঁর কাছে সমান পূজ্য। কেমন করে ঘটবে এ ভক্তির প্রকাশ তারও এক সহজ-সরল পথ দেখিয়েছেন তিনিই। সে ভক্তি প্রকাশের পথ ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে নয়—আড়ম্বরের আতিশয্যে নয়—শুধুমাত্র ভগবানের নাম গানেই হবে সে ভক্তির পূর্ণ প্রকাশ। নাম কীর্ত্তন করলে সমস্ত দেহমন হবে সুখস্নানে প্লাবিত, হৃদয় করবে অমৃতের আস্বাদন। দূর হবে পাপ, প্রাপ্তি হবে প্রেম। চেতনার এমন নিবিড় উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেইতো তিনি শ্রীচৈতন্য।

তাঁর চোখে প্রেমের স্বরূপ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ হলেন সেই কৃষ্ণ যাঁর হাসি মধুর; বাঁশি মধুর, ভাব মধুর, স্বভাব মধুর, রূপ মধুর, বিপু মধুর—যাঁর সকলই মধুর। যাঁর রূপে নয়ন দিয়ে বিশ্ব হয় মধুময়। সেই মুরলীমোহন কৃষ্ণ প্রেমে যিনি পাগল হয়ে ভেসে বেড়াতে পারেন স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁরই বন্ধনে বাধা পড়েন। সেই ভজ আর ভগবানের মাঝে অন্য কোন প্রতিনিধি নেই, নেই গুরু, নেই পুরোহিত, নেই পুতুল, নেই দেউল। দেব মানবের এই অবাধ যুগল মিলন, এইতো সুন্দর এই তো সুমধুর। এই মধু মিলনের ধারক রূপে, প্রেম ও ভক্তির বাণী বিলোতে মধ্য লীলায় তিনি পদব্রজে পরিক্রমা করেছেন সমগ্র ভারততীর্থ। তারপর সে আনন্দে উথলি উঠেছে সপ্ত সিন্ধু, প্রেমের প্লাবনে ভেসে গেছে দেশ দেশান্তর তাই আমাদের পরাণ সখা গৌর গোপাল মধুরের সওদাগর।

> "ভগবান করুন, আমরা যেন সকলেই গৌরাঙ্গের মদনমোহনে দগ্ধ হই।"
>
> —মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত।

সে হয় আমার প্রাণ রে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভক্তি আর মুক্তি, জীবনের সার কথা। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম হল প্রেম-ধর্ম। ঈশ্বরে প্রেম, জীবে প্রেম। সেই মহান সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসলে তাঁর সৃষ্টিকেও ভালবাসা যায়। ধীরে ধীরে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হয়ে অদ্বৈত আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে। পৃথিবী তখন আর তিন পুরুষের খেলা নয়, এক এবং একাকার। পাঁচশো বছর ধরে যে ভাবতরঙ্গ অব্যাহত, অপ্রতিরোধ্য তার প্রাণরসের বিশ্লেষণ করলে আমরা কি পাই, কোনও গোঁড়ামি নেই, আত্মপ্রচার নেই, মন্দির মসজিদ নেই, ধর্মগুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নেই। তিনি নিজে মেতে অন্যকে মাতিয়েছিলেন। আমি আমার পথে চলি, ইচ্ছে হয় তোমরা এসো, অনুভব করো,

'ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥'

আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও। তাঁর মধ্যে 'তিনি' অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জগৎ জুড়ে যুগে যুগে এই লীলাই চলেছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আর বিচারের দ্বারা সহজেই বোঝা যায়, শক্তি এই ভাবেই অবতীর্ণ হন। কখনও যীশু, কখনও বুদ্ধ; কখনও শ্রীচৈতন্য, কখনও রামকৃষ্ণ। কেউ বলছেন সাকার কেউ বলছেন নিরাকার শূন্য, কেউ বলছেন প্রেম। কখনও তিনি ভালবাসা, কখনও তিনি মায়াশূন্য কঠোরতা, কখনও জগৎ মিথ্যা, কখনও পৃথিবী তাঁর প্রেমের উদ্যান। কখনও জীবই শিব, কখনও শিবই শক্তি। বেদান্ত নির্বেদান্ত, সৃষ্টি থেকে স্রষ্টা স্রষ্টা থেকে সৃষ্টি সব মিলে মিশে একটি মাত্র সত্য আনন্দ। আনন্দং খল্বিদং ব্রহ্ম।

শ্রীচৈতন্য যখন নিমাই ছিলেন, তখন তাঁর এক রূপ। সাধারণ মানব শিশু, দুর্দান্ত দুর্বিনীত। যৌবনারম্ভে পণ্ডিত, তার্কিক। সময় সময় পরিব্রাজক। প্রথমা পত্নীর সর্পাঘাতে মৃত্যুর পর গয়ায় গেলেন পারলৌকিক ক্রিয়াদির জন্যে। আর সেইখানেই তাঁর চৈতন্যোদয়, ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। চৈতন্যোদয়ের এই হল ধারা। প্রয়োজন সামান্য একটু ধাক্কার। সামান্য আঘাতেই, প্রেম ভক্তি আর বৈরাগ্যের উৎসমুখ খুলে যায়। বুদ্ধ হলে বলতেন, ভালো করে চেয়ে দেখ, এই তোমার জগৎ। এ যেন চিত্র বিচিত্র রঙ করা এক রাজরথ। এই রথে একমাত্র মূর্খরাই ডুবে থাকে। জ্ঞানীরা এই রথে বন্দী থাকে না। জগৎ এক মায়া বুদবুদ। মায়াতেই সব সত্য মনে হচ্ছে। মায়ার বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাও মৃত্যুর রাজা তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। শঙ্কর হলে বলতেন,

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব-বিচিত্র।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

শ্রীচৈতন্যও বললেন,

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রথমপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' প্রেমানন্দে নৃত্য করেছেন। কৃষ্ণের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেই কৃষ্ণ হয়ে গেছেন। আর তাই হয়। শঙ্কর বলেছেন,

ভাবিতং তীব্রবেগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং শেযং ভ্রমরকীটবৎ ॥

তীব্র বিশ্বাস আর তন্ময় ভাবনায় ভাবুক আর ভাবিত এক হয়ে যায়। যেমন বোলতা আর কীট। বোলতা যখন

কোনও কীটকে ধরে তার গর্তে নিয়ে আসে তখন সেই কীট প্রাণভয়ে বোলতার কথা একাগ্রভাবে চিন্তা করতে করতে বোলতাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

সনাতন গোস্বামী বৃহৎ ভাগবতামৃতে বর্ণনা করেছেন, প্রভুর ভাববিকারের অবস্থা ঃ

কীর্তয়ন্তং মুহুঃ কৃষ্ণং জপধ্যানরতং ক্বচিৎ।
নৃত্যন্তং ক্বাপ গায়ন্তং ক্বাপি হাসপরং ক্বচিৎ॥
বিক্রোশন্তং ক্বচিদ্ভুমৌ স্খলন্তং ক্বাপি মত্তবৎ।
লুঠন্তং ভুবি কুত্রাপি রুদন্তং ক্বচিদুচ্চকৈঃ॥

অপূর্ব অবস্থা কখনও কৃষ্ণ নামে বিভোর। কখনও জপ আর ধ্যানে তন্ময়। কখনও নৃত্যে উন্মাদ। কখনও গান করছেন, কখনও হাসছেন, কখনও চীৎকার কখনও মাটিতে গড়াগড়ি, কখনও আকুল ক্রন্দন। নিমাই থেকে শ্রীচৈতন্যে আসার এই পথ, এই পদ্ধতি। গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণে উত্তরণেরও এই একই পথ। আকুলতা আর ব্যাকুলতা। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

অনন্যচিত্ত হয়ে নিত্য নিরন্তর ভজনাই হল পথ, আর অবতার পুরুষেরা আসেন যুগে যুগে আমাদের সেই পথ দেখাতে। এ যেন অঙ্ক কষে সঠিক ফল দেখানো। দুই আর দুইয়ে চার। যার বিশ্বাস হবে, মামনুসর আমাকে অনুসরণ করো। শ্রদ্ধা ভক্তি আর প্রেম। এই হল হাতিয়ার।

সুদীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে যাঁর প্রেমের ধারা ভক্তির ধারার প্লাবন সমানে বয়ে চলেছে, তাঁর শক্তির উৎস কোথায়। কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তির খেলায় এই উন্মাদিনী প্রভাব আজও অব্যাহত তার সামান্য বিশ্লেষণ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চৈতন্যধর্ম আজ বিশ্বধর্ম। যে ধর্মের বাণী এত সহজ সরল, সেই ধর্ম কেমন করে এত ব্যাপক প্রসার লাভ করল। সব ধর্মেরই একটা গতি আছে একটা লক্ষ্য আছে। সাধককে একটা স্তরে একটা অবস্থায় নিয়ে যেতে চায়। বৈদান্তিক চান জ্ঞানের পথে ব্রহ্মে লীন করে দিতে। মায়ার আবরণ খুলে জীবকে দেখাতে চান ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা আমি আর তুমির ভেদ তিরোহিত। তুমিই আমি, আমিই তুমি। সোহম্, এই উপলব্ধি বড় কঠিন। এই স্তরে মন দিয়ে উঠতে হবে। মন আর মনন এই হল সাধকের হাতিয়ার

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মোপনিষদং
মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা, মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ-
নিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে
য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥

আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বাক্য, প্রাণশক্তি, চক্ষু, কর্ণ, বল, সমস্ত ইন্দ্রিয় পূর্ণ বিকশিত হোক। উপনিষদে যা যা ব্যক্ত হয়েছে সবই ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি। ব্রহ্ম যেন আমাকে অস্বীকার না করেন। ব্রহ্ম যেন আমায় পরিত্যাগ না করেন, আমি যেন ব্রহ্মকে না পরিত্যাগ করি। উপনিষদে আমি যে ভাবে প্রতিভাত সেই ভাবেই যেন আমার বিকাশ হয়। আমি যে আত্মার অবিনাশী ধারার অনুগামী। সেই আত্মজ্ঞান আমি যেন লাভ করি।

'আমি ব্রহ্ম' বলা সহজ, হওয়া বড় কঠিন। বুদ্ধের শূন্যবাদ, সবই মিথ্যা, বড় ভীতিপ্রদ অনুভূতি। দেখছি আছে অথচ নেই, এই অনুভূতিতে আসা সহজ নয়। গীতা প্রায় এই কথা বলেছেন ; কিন্তু মধ্যভাগ স্বীকার করে নিয়েছেন। নেই বলে উড়িয়ে দেন নি। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন,

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

জীব আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে অর্থাৎ স্থিতিকালে প্রকাশিত, বিনাশান্তে অর্থাৎ প্রলয়ে আবার অপ্রকাশিত। অর্থাৎ এ পাশে নেই, ওপাশে নেই, মাঝে আছে। বুদ্ধেরও সেই এক উপদেশ।

when a man considers this world as a bubble of froth and as the illusion of an appearance, then the king of death has no power over him.

এই আছের পর্যায়টাকে যে বুদ্‌বুদ বলে ভেবে নিতে পারে, দৃশ্য জগৎকে যে মায়া বলে জানে, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এই সব কথায় তত্ত্ব আছে, সুন্দর একটি মানসিক অবস্থায় পেঁৗছে দেবার প্রতিশ্রুতি আছে, নেই পদ্ধতি, নেই আনন্দ।

চৈতন্যের ধর্ম ও সাধনা, দেহীর ধর্ম, দেহীর সাধনা। কোনও 'নেগেশান' নেই। সহজ সরল একটি পদ্ধতিও আছে। ভক্ত কবির কথায়, দৃষ্টিতে, অনুভূতিতে।

নাম এনেছে নাম এনেছে নাম এনেছে রে।
প্রেম এনেছে প্রেম এনেছে প্রেম এনেছে রে॥

রঘুনাথ দাসকে উপলক্ষ করে প্রভুর সহজ উপদেশ ঃ

গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানস করিবে।

জাত বিচার নেই। অনুশাসন নেই। পাপ নেই, পুণ্য নেই। মার মারীর ভয় নেই। শুধু নাম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

সংকীর্তন, নাম সংকীর্তন, নিরবচ্ছিন্ন নাম গানেই আছে তন্ময়তা একাগ্রতা, প্রাণায়াম,। নামেই আছে নামীর সঙ্গে লীন হয়ে যাবার সহজ উপায়।

এই সহজ পদ্ধতি, প্রেম আর ভক্তি এই ত্রিবিধ মিলনে চৈতন্য-ধর্মে এসেছে প্লাবিনী প্রাণধারা। যুগ থেকে যুগে প্রবাহিত। করার মতো একটা কিছু আছে। শুধু ভাবনা নয়, দুরূহ ধ্যান নয়, শুধু ভক্তি।

যার মুখে নাহি ভক্তি কথা।
তপ শিখা সূত্র ত্যাগ সব তার বৃথা॥

শ্রীচৈতন্য ছিলেন সর্বশাস্ত্রে সুপন্ডিত। তিনি তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন, বেদান্তের পথ জটিল, বেদের পথে শুধু চাওয়া। অজস্র কামনা। তোমরা সহজ পথে চল।

তুণ্ডে তান্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুন্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণ-ক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

আমার জীবনে শ্রীচৈতন্যের কৃপাসূত্র

শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর (বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্ট)

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের শুভ ৫০০ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে যে স্মরণিকা উদ্যোক্তারা প্রকাশ করছেন তাতে আমার বিনীত, সনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অর্পণ করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্যা মনে করছি।

বহু জন্মের সুকৃতির ফলে ৺পিতা ডাঃ শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতা ৺সুধারাণী দেবীর সন্তান হয়ে জন্ম গ্রহণ করি। অতি শৈশব কালে তাঁরা আমাকে, মানবজাতির প্রতি মহাপ্রভুর অকৃত্রিম অনুরাগ কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তিবাদের প্রতি পরিচিতি করিয়ে দেন।

নীলাচলে সমুদ্র-সৈকতে শ্রী হরিদাস ঠাকুরের মঠের পাশে আমার মাতুলালয়। ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম ভাঙ্গতো, গগন বিদীর্ণ করে উদাত্ত কণ্ঠে সমবেতভাবে মঙ্গল আরতি ও গৌর ভক্তদের কীর্ত্তন—

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"॥

প্রভু হরিদাস ঠাকুরের মঠে অধিষ্ঠিত কি অপরূপ মূর্ত্তি-ত্রয়—মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ দুই পাশে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভু। ঠিক সামনেই হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির। পরম ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের মহা-প্রয়াণে প্রভু স্বয়ং তাঁর মরদেহ কোলে তুলে নৃত্য করতে লাগলেন আত্মহারা হয়ে। ভক্তগণ সংকীর্তনে মুখর। তিনি নিজেই সমাধি দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে সেই স্থানটি মহাতীর্থে পরিণত হোলো। সেই মহাতীর্থে শুরু হোলো আমার নাম কীর্ত্তনের হাতেখড়ি। জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে ফেরার পথে, পিতামাতা মন্দির পার্শ্বে দোকানীর কাছ হতে কিনে দিলেন ছোট্ট করতালি বা খঞ্জনী। ফিরে এসে ছোট্ট ছোট্ট হাতে করতালি বাজিয়ে গোপীদাস বাবাজী ও অন্যান্য গৌর ভক্তদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মহাপ্রভুর মন্দির, ঠাকুর হরিদাসের সমাধি মন্দির প্রদক্ষিণ করে উচ্চকণ্ঠে হরিনামের গোড়াপত্তন হোলো। তার পরে পোস্তার রাজবাটীতে বাবাজী মশায়ের নিজ কণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন শুনে শ্রবণেন্দ্রিয় মোহিত হোলো। বরাহ-নগরের পাঠবাড়ীতে তাঁর পাদস্পর্শ লাভ করতে আমি সক্ষম হয়েছি। কেদারদার সুন্দর ভাগবত পাঠ এখনও কর্ণমূলে ধ্বনিত হয়।

শৈশবের সেই সব স্মৃতি ও গৌরপ্রীতি আজও মণি-কোঠায় বিরাজ করে। আ ব্রাহ্মণ চণ্ডালে তাঁর প্রেম যা ধর্ম্ম জাতি গোষ্ঠীর ঊর্দ্ধে। তৃণ হইতে তৃণ, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে, আত্মাভিমান পরিত্যাগ করে সদা সর্ব্বদা হরিনাম, কৃষ্ণনামে নিজেকে বিভোর রাখাই তো আসল ধর্ম্ম। কলিতে নামই মন্ত্র, তন্ত্র ও শাস্ত্র।

সর্ব্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ, তাঁর নাম সংকীর্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, প্রভুর দাসানুদাস জ্ঞানে সেই সব গুণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখা। সুখে দুঃখে তিনিই তো একমাত্র বন্ধু সখা—তাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণেই সম্পূর্ণ-ভাবে আত্মসমর্পণ। ভক্তি সাধনার এই মহিমা। যেখানে নাম, সেখানেই তাঁর অধিষ্ঠান নামের মধ্যেই নামীর প্রকাশ। এর আগে কি কেউ জানতো নামের এত মহিমা, এত মাধুর্য্য। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ধ্যান, যাগ, যজ্ঞ, কঠোর পূজা অর্চ্চনায় যে ফল পাওয়া হোতো, কলিযুগে শুধুমাত্র ঈশ্বরের নামই যথেষ্ট। নামাভাসেই মুক্তি।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে পা ফেলে অগ্রগতির পথে চলতে গিয়ে আমরা যেন বড় আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থান্বেষী হয়ে গেছি। এই বস্তুতান্ত্বিক জীবনে মহাপ্রভুর মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পরেছি। একে অপরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা সর্ব্বজীবে প্রেম বিতরণে বিমুখ। এখনও দলাদলি

বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনকে গ্রাস করতে উদ্যত। শুধু মাত্র ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র বিশ্বে মূল্যায়নবোধের এক অবক্ষয়। পৃথিবীর মানুষ আজ মহাপ্রভুর জীবন দর্শন সেই অকৃত্রিম প্রেম থেকে বঞ্চিত—যে প্রেমের মাধ্যমে আমরা সত্য, ধর্ম, শান্তি ও অহিংসাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ব্রাহ্মণে শুদ্রে, উচ্চ নীচে, স্ত্রী পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সেই বাণী নষ্ট-ভ্রষ্ট নির্বোধ, নিষ্ঠুর মানুষকে তার দেবময় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ দেয়। জীবকে সমস্ত সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন সমন্বয়বাদী প্রেমের অবতার। শ্রী চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মই তো লৌকিক ধর্ম মানবপ্রেমের মাধ্যমেই বাংলার নব জাগরণের শুরু। তিনি ছিলেন নব যুগের দিশারী। তাঁর জীবন, তাঁর বাণী জনমানসে এক মহাবিপ্লব ঘটালো···অপমানিত, অবহেলিত, সর্বহারা পুনর্জীবন লাভ করলো, সাম্যধর্মে মুক্তির সাধ পেলো। সকলেই তো সেই মঙ্গলময়ের সন্তান। সমাজ জীবনে নূতন চেতনা জেগে উঠলো। নামে জনজীবন মুখরিত হোলো।

সেই তত্ত্বজ্ঞানী, পণ্ডিত, ভাববাদী দার্শনিক সমাজতত্ত্ববিদ নররূপী নারায়ণ বা রাধাকৃষ্ণ যুগল সত্তার জীবন দর্শন এর প্রাসঙ্গিকতা তাঁর স্মরণ মনন এর একান্ত প্রয়োজন এখন। অবহেলিত, লাঞ্ছিত বঞ্চিত, নারী জাতিকে তাঁদের পূর্বের গৌরবান্বিত সম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেন তাঁদের নব জীবনের সন্ধান দেন। আজ তারাও এখন লাঞ্ছিত নিপীড়িত।

তাঁর জীবন বেদ প্রেম, মৈত্রী ও সাম্যের বাণী সর্বজন ও সর্বকালের জন্য—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্"।

হরি কথা কথা, আর সব বৃথা—ব্যথা।

—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২। পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতা পুলিশ বিভাগ।

৩। বরাহনগর পৌর-প্রতিষ্ঠান।

৪। সংবাদপত্র সমূহ।

৫। আকাশবাণী।

৬। কলিকাতা দূরদর্শন।

৭। কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি।

৮। পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস।

৯। সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স।

১০। রেড ক্রশ।

১১। কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ।

১২। বরাহনগর জুট মিল।

আমাদের এই আশ্রমে শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত জন্ম বার্ষিকী উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়ার জন্য উপরি উক্ত যাঁহাদের এবং অন্যান্য সকলের অকৃপণ সাহায্য এবং উদার সেবার হস্ত আমাদের উদ্দেশ্যে প্রসারিত হয়েছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাছে তাঁহাদের উত্তরোত্তর সর্ব্ববিধ কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমাদের এই উৎসবে বিভিন্ন বিষয়ে এবং স্মরণিকা প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত কোন না কোন ত্রুটি থাকিতে পারে বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ইতি

বিনীত নিবেদক

পাঠবাড়ী আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ।